# আনন্দমেলা

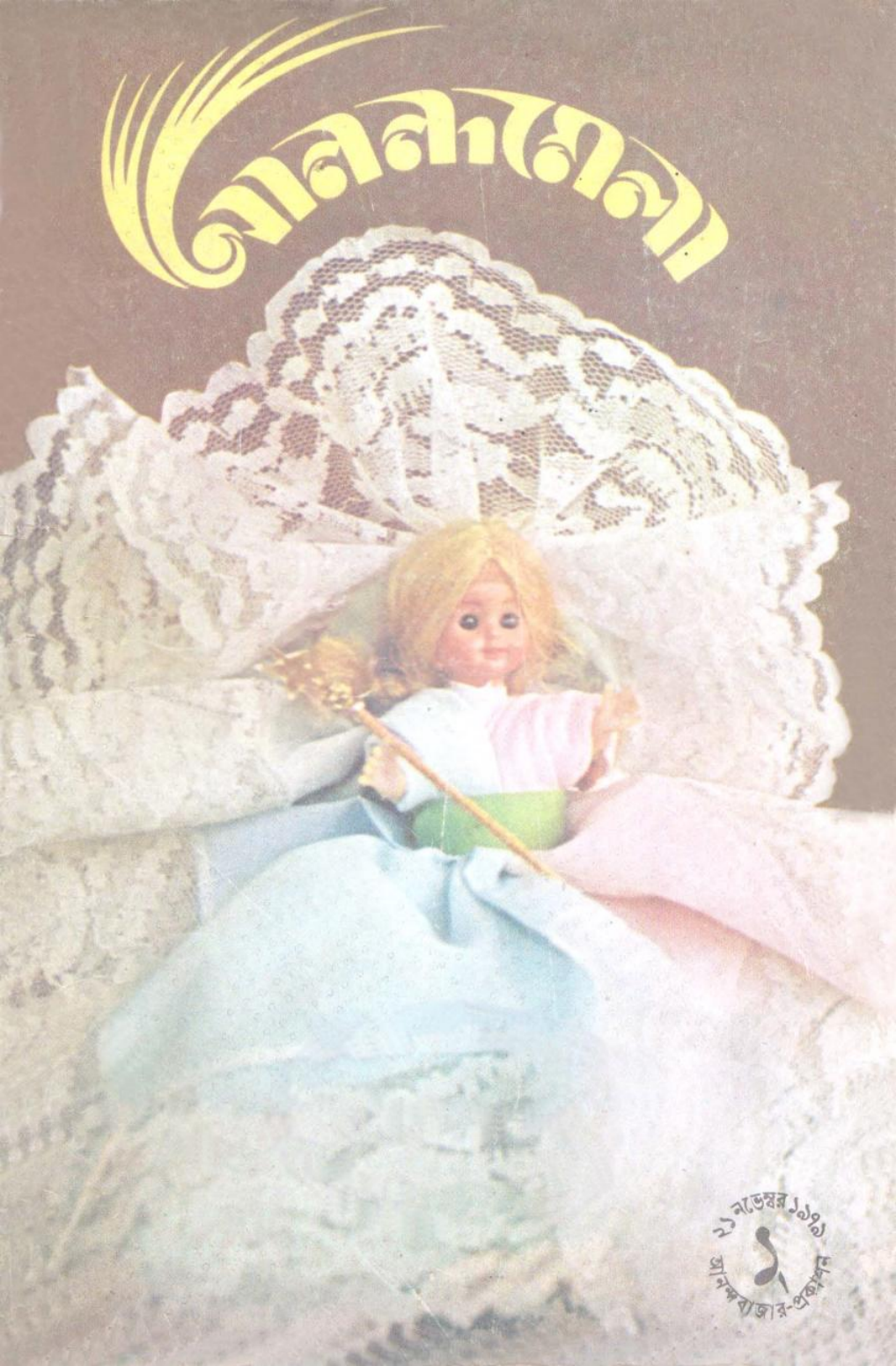



২১ নভেম্বর ১৯৭৯

১

আনন্দবাজার-প্রকাশন

# বব-এর সঙ্গে দুনিয়া সফর

## পাখী দেখ! দেশ চেনো!

এইসব পাখী কোন্ কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়?

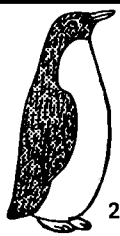


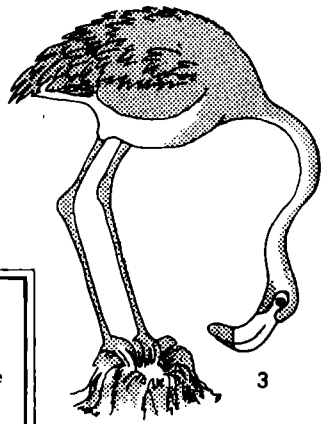


আনন্দময় শৈশব— রাষ্ট্রের গৌরব

Happy Child-Nation's Pride

বিশ্ব শিশু বর্ষ - ১৯৭৯

International Year of the Child.

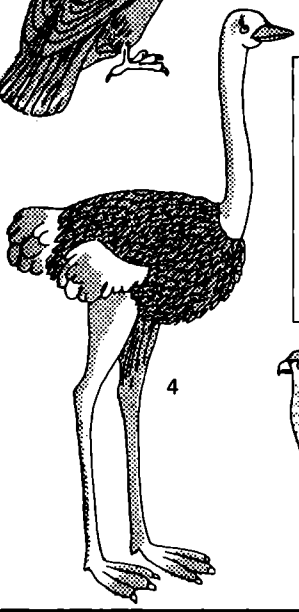


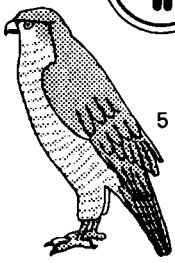


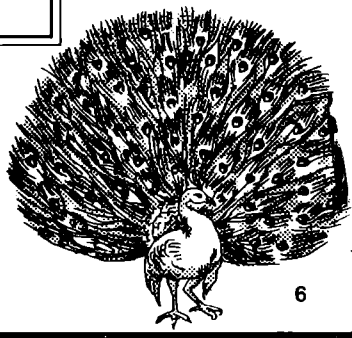


মাইনর্স সেভিংস-এ খাতা খুলুন

সঞ্চয়ের অভ্যেস, খুব ভাল অভ্যেস

BANK OF BARODA

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

# আনন্দমেলা

৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ • ২১ নভেম্বর ১৯৭৯ • ৫ বর্ষ • ১৩ সংখ্যা

**ভ্রমণ-কাহিনী**
সেশেল্‌স । বুদ্ধদেব গুহ ৪
**গল্প**
তাম্পিদার সাপ শিকার ।
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১০
নিকটমতীর ফল । অনিরুদ্ধ কর ৪৩
**উপন্যাস**
কে । বিমল মিত্র ১৫
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
**আত্মকথা**
খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ৩৭
**ছড়া**
দোস্তির টান । শান্তনু দাস ২৫
দাবা । অভীক বসু ৪৫
রানীর গল্প । শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত ৫৯
ধরার ছড়া । রাখাল বিশ্বাস ৫৯
**চিত্রকাহিনী ও কমিকস**
সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪
**লেখাপড়া**
ভাষার খেলা । কুন্তক ৪৮
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৪৯
**খেলাধুলো**
শূন্য দিয়েই শুরু । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫১
নাটকে-ভরা ক্রিকেট । অলোক দাশগুপ্ত ৫৩
রাবার জয় । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৫৫
ফুটবলের জয়জয়কার । অশোক দাশগুপ্ত ৫৭
জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল । পুষ্পেন সরকার ৫৮
**অন্যান্য আকর্ষণ**
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ১৮, ছবির মজা ৩৩,
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৪৬,
নদনদী ৬২, জবর খবর ৬৩,
আঁকো ৬৬, শেখো ৬৬
**প্রচ্ছদ** তপন দাশ

সম্পাদক **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

# চিঠি ও জবাব

প্রিয় কলকাতা,

আজ তুমি সারা ভারতের কাছে উপেক্ষিত। এমন কি তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছ তারাও তোমায় ঘৃণা করে।......। সকলে নিজের কথা ভাবে, তোমার কথা কেউ ভাবে না বলে তুমি দুঃখ করছ। কিন্তু হয়ত তুমি জানো না, আমার মত অনেক ছোট ছোট বন্ধু তোমার মোহিনী মোহন রোড, ভবানীপুর পাড়ায় গাছপালা লাগিয়েছিল। কিন্তু হায়, ছোট বন্ধুরা কিনা তাই বড়দের তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞায় আমরা বিফল হলাম। কিন্তু তাই বলে ভেব না, তোমার কথা ভুলে নিরাশ হয়ে বসে আছি।

তাই আমরা আবার ক্যালকাটা ক্লিনিং ক্লাব গড়ছি।......আমাদের কাজ হবে (১) সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে পাড়ায় গাছ লাগানো। (২) সম্পর্কিত দপ্তরের অনুমতি নিয়ে পাড়ার এক জায়গায় নোংরা ফেলার ড্রাম বসিয়ে পাড়া পরিষ্কার রাখা। (৩) রাস্তা ফেটে জল বেরোলে, বা ফুটপাত অনেকদিন ভাঙা পড়ে থাকলে, রাস্তায় গর্ত হলে ঠিক জায়গায় খবর দেওয়া এবং চারদিকে পোস্টার লাগিয়ে কলকাতার অধিবাসীদের কলকাতা পরিষ্কার এবং সুন্দর করা সম্বন্ধে সচেতন করা। ইতি—

**জ্যোতি**

জ্যোতি পারেখ, ২২ সি মোহিনী মোহন রোড
কলিকাতা ৭০০০২০
১০-১০-৭৯

প্রিয় জ্যোতি,

তোমাদের সমবেত সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলকাতা একদিন নিশ্চয়ই সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে [illegible] লেখাপড়া[illegible]। কিন্তু মনে রেখো, মাঝপথে দমে গেলে চলবে না কিন্তু। কলকাতা উন্নয়নের কথা ভেবেই ধৈর্য [illegible] বা উদাসীনতা মানলে চলবে না। পোস্টার লাগালে বাড়ির দেওয়াল নোংরা হয়। কারুও হয় না। [illegible] সকলকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে পারো—[illegible] সকাল আটটার মধ্যে যাতে বাড়ির আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ে তার জন্য বারবার অনুরোধ জানাতে পারো। ইতি—

**কলকাতা নগরী**

জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে প্রচারিত।

# সেশেলস্

বুদ্ধদেব গুহ

দ্বীপ থেকে দ্বীপে যায় এই ছোট্ট প্লেন

এমন যে কোনো জায়গা আছে বা থাকতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেও গেছি আমি; তবুও।

প্লেনটা যখন নীচে নামতে লাগল তখন জানলা দিয়ে চেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। সবুজ, নীল, গেরুয়া, হলুদ, সাজিমাটি আর পাট-কিলে রঙের যে কী সমারোহ — কী বলব। ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ। কোনো স্বপ্নও বুঝি এমন রঙিন বা সুন্দর হয় না! এমন কোনো দ্বীপের কাছে আমার জাহাজ-ডুবি হলে রবিনসন ক্রুসোর মতো নির্বাসনে থাকতেও আমার আপত্তি ছিল না।

জেট প্লেনটা নিচু হতে হতে যখন এয়ার-পোর্টের টারম্যাক ছুঁল তখন মনে হল এক্ষুনি বুঝি সমুদ্রের জলেই পড়ে যাবে। ট্যাক্সিইং করে গিয়ে যেখানে মুখ ঘোরালো সেখানেও মনে হল যেন হাত বাড়ালেই সমুদ্র ছোঁয়া যায়।

প্লেন থেকে নেমে দেখি এয়ারপোর্টের ডান-দিকে, স্টার বোর্ড সাইডে সমুদ্রের সবজে-নীল ধু-ধু জলের মাঠ পেরিয়ে কাছে ও দূরে দিগন্তরেখার উপর ছোট-ছোট তিনটি দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

এইই তাহলে সেশেলস্ দ্বীপপুঞ্জ।

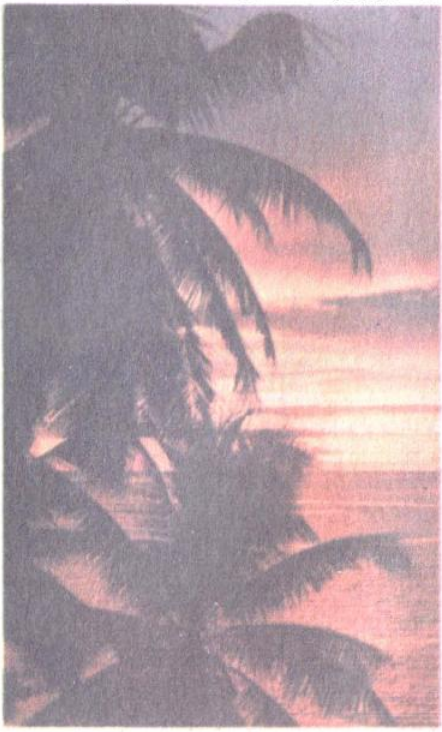

সূর্য যখন অস্তগামী

আকাশ থেকে সবুজ দ্বীপ

মাছ আছে অনেক রকম

এয়ারপোর্টের নাম মাহে। দ্বীপের নামেই নাম। বললে বিশ্বাস করবে না, এই দ্বীপ-পুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ মাহে।

কত বড় এলাকা বলো তো?

মস্ত বড়।

সতেরো মাইল লম্বা আর মাইল তিনেক চওড়া—তাও আবার সমতল জমি নয়। পাহাড়-টাহাড় সব নিয়ে।

সেশেলসের বানান Scychelles। একটু গোলমেলে। তাই না?

ফরাসি ভাষায় এমন একটু গোলমাল হয়ই।

আমারও হয়েছিল। ওখানে PRASLIN বলে একটা দ্বীপে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে প্লেনের টিকিট কাটতে গিয়ে বলেছিলাম, প্রাস-লিনের টিকিট চাই। কাউন্টারের মেয়েরা তো হেসেই বাঁচে না কথা শুনে। আমি বোকার মতো চেয়ে থেকে ইংরেজিতে বানান করে লিখলাম PRASLIN, তখন ওরা হেসে উঠে বলল, ওমা! তাই বলুন। প্রালেঁ আইল্যান্ড?

কান্ড দ্যাখো একবার।

আমি এয়ারপোর্টের কাছেই একটি বাড়িতে ছিলাম। এলাকাটার নাম কাসকাড। একপাশে সমুদ্র আর সমুদ্রের প্রায় গা-ঘেঁষে উঠে গেছে

খাড়া পাহাড় বনজঙ্গলে ভরা। এ দ্বীপে সাপ নেই, কোনো জানোয়ার নেই এক কচ্ছপ ও কাঁকড়া ছাড়া। যেখানে খুশি শুয়ে-বসে থাকা যায়।

আমার দুজন বন্ধু হয়েছিল ওখানে, নাম ভ্যালোরি ও রোজা। ওরা আসলে ফরাসিনী, কিন্তু অনেকদিন এখানে থাকার জন্যে ক্রেওলও বলতে পারত। ক্রেওল ফরাসি ও আফ্রিকান মেশানো ভাষা। ওরা না থাকলে সব ঘুরিয়ে কারা দেখাত জানি না। ট্যাক্সি-ওয়ালারা অবশ্য ইংরেজি শিখে নিয়েছে। সেশেলসের অফিসিয়াল ভাষা দুটো—ফরাসি এবং ইংরেজি।

আমার শোবার ঘরের পাশেই সমুদ্র। বাড়িটা আসলে সমুদ্রের মধ্যেই। সমুদ্র ভরাট করেই বাড়ির সামনের জায়গাটুকু বের করা হয়েছে। তাই জানালা খুললেই সমুদ্র। সামনেই ঘেরা বারান্দা। তাকালেই দেখা যায় কাছেই সমুদ্রের মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপটির নাম 'অনামা'। ইজিচেয়ারে বসে, বই পড়ে আর বালিয়াড়ি নারকোল-বন আর নীল জলের দিকে চেয়ে দুপুরবেলাটা কেটে যেত। সন্ধের সময় পশ্চিমের আকাশে যে কত রঙ নিয়ে হোলি খেলা চলত আর ঝকঝকে জলের আয়নায় সেই হোলি খেলার ছায়া পড়ত তা কী বলব।

ছোট্ট লাল মিনিমোক গাড়ি করে আমরা বেড়াতে বেরোতাম। চারদিক খোলা জীপের মতো গাড়ি। হু-হু করে হাওয়া লাগত গায়ে, এলোমেলো হত চুল। অনেক জায়গায় রাস্তাটার নীচ দিয়ে চলে গেছে সমুদ্র। মানে সমুদ্রের মধ্যের জল জবর-দখল করে কংক্রীটের পিলার তুলে তার উপরে পথ বানানো হয়েছে। ফরাসিরা যে স্থাপত্যবিদ্যাতে পার-দর্শী তা বোকারাও বুঝতে পারবে এই স্বপ্ন-রাজ্যে এলে।

বোঁভালোতে খুব সুন্দর সমুদ্রতট আছে। ভিকটোরিয়াতে অনেক বড়-বড় হোটেল আছে। সেখানকার পায়ার থেকে স্টীমার ছাড়ে অন্যান্য নানান দ্বীপে যাওয়ার জন্যে। বার্ড আইল্যান্ড, প্রালেঁ সিলহুট আইল্যান্ড, লা-ডিগ ইত্যাদিতে। বার্ড আই-ল্যান্ডে পাখি আছে নানা রকম। সব দ্বীপেই সার্ফ-রাইডিং, স্নরকেলিং সুইমিং, ফিশিং

সেশেলসের ছেলেমেয়েরা

নারকেল-পাতার ফাঁকে সূর্য উঠছে

ইত্যাদি চলে। মাহে ছাড়া অন্যান্য সব দ্বীপ খুবই ছোট আয়তনে। চারদিকে নারকোল বন, নানা রকম ট্রপিকাল গাছ-গাছালি। আমাদের কাঁঠাল গাছের পাতার মতো পাতা-ওয়ালা এক রকমের গাছ হয়, ওরা বলে টাকামাকা।

একটি বিখ্যাত তট আছে মাহেতেই—নাম টাকামাকা বে। যেদিকে তাকাও দেখবে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বোগেনভিলিয়ার সঙ্গে মাথা টান-টান হঠাৎ উঁচু কালো পাহাড় আর নীল সমুদ্রের কোলাকুলি। চার ধারে কোরাল রীফ থাকায় উপর থেকে তাই এত সুন্দর দেখায় দ্বীপগুলো। দ্বীপে বসেও সুন্দর লাগে। প্রাকৃতিক অঢেল সৌন্দর্য ফরাসিরা নিজের রুচি ও সৌন্দর্য জ্ঞানে আরও সুন্দর করে তুলেছেন।

এখন কিন্তু সেশেলস স্বাধীন দেশ। ব্রিটিশ কামানওয়েলথের সভ্য। হয়তো সবচেয়ে ছোট সভ্য। ওখানে যেতে ভারতীয়দের ভিসা লাগে না। বোমবাই থেকে মোট সাড়ে তিন ঘন্টার উড়ান। যদি কখনও তোমরা যেতে পারো তো যেও। খুবই ভাগ লাগবে।

ঐ দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস হচ্ছে 'কোকো-ডে-মেয়্যার'। মানে সমুদ্রের নারকোল। প্রকাণ্ড বড় এই অদ্ভুত-দেখতে নারকোলগুলো পৃথিবীর আর কোথাও নজরে হয় না। এই গাছ নাকি সমুদ্রের নীচের গাছ। কখনও হয়তো এই সব দ্বীপ জলের তলা থেকে প্রাকৃতিক কারণে জলের উপরে মাথা তুলে ওঠে। তখন থেকেই এই কোকো-ডে-মেয়্যারের গাছ আছে এখানের দ্বীপগুলিতে। এখান থেকে অন্যত্র গাছ নিয়ে গিয়েও কেউ বাঁচাতে পারেননি।

কোকো-ডে-মেয়্যারের পরেই হচ্ছে জায়ান্ট টরটয়েজ। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সব সামুদ্রিক কচ্ছপ। তটেও হেঁটে বেড়ায়।

মাহের মধ্যেই, বেশ ভালো ঘুরে যেখানে দারুণ-দারুণ সব হোটেল আছে সমুদ্র-তটের কাছাকাছি, আমরা বেলোমে গেছিলাম একদিন। কবে নাকি কোন জলদস্যুরা, পর্তুগীজও হতে পারে, ভারতীয়ও হতে পারে, ইংরেজও হতে পারে, এই বেলোমে তাদের লুঠ-করা ধনরত্ন পুঁতে রেখে গেছিল। কয়েকজন লোকে মিলে-মিশে সেই গুপ্তধন খুঁড়তে ব্যস্ত। গুপ্তধন সত্যি আছে কী না এবং থাকলে কী আছে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। কিন্তু যাঁরা সমুদ্রের গায়েই পাথরের বিরাট কুয়ো খুঁড়ে চলেছেন তাঁরা দমবার পাত্র নন। অনেক দিন ধরে নাকি চলেছে এই খোঁড়াখুঁড়ি। যা পাওয়া যাবে, তার উপর সেশেলস সরকারকে ট্যাক্সও দিতে হবে। তবুও তারা চালিয়ে যাচ্ছে দারুণ উদ্যমে—কয়েক বছর হল।

সেশেলস ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মহা-

বিরাট কচ্ছপের পিঠে ছোট্ট ছেলে

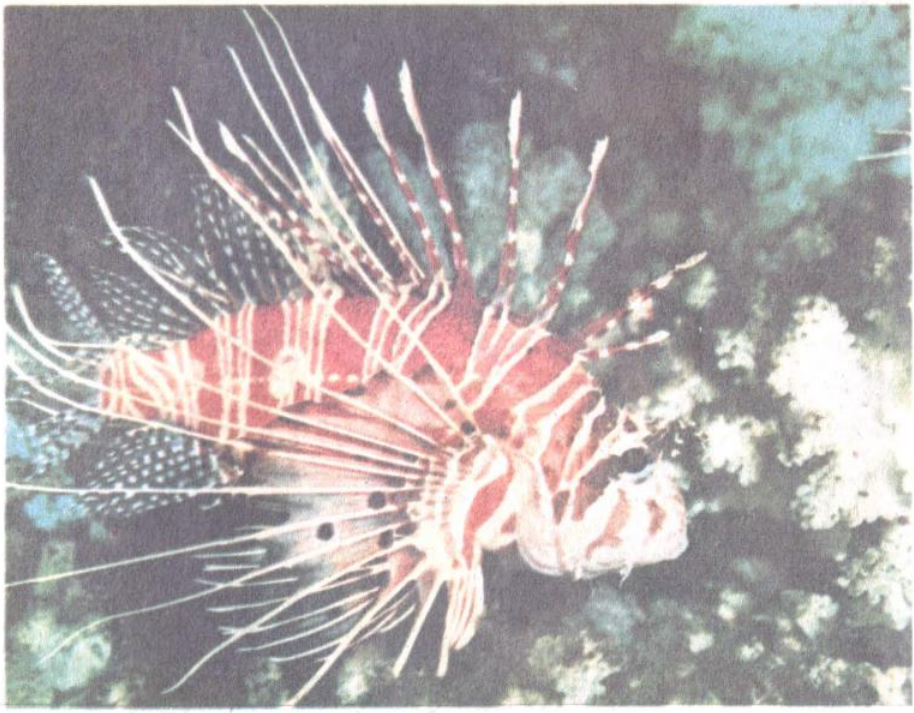

ডানাওয়ালা ফায়ার-ফিশ

দেশের মাঝামাঝি। উপরে জাঞ্জিবার। নীচে মরিশাস। আসলে সেশেলস এতই ছোট জায়গা যে, খুব কম লোকেই এর খোঁজ রাখেন। পৃথিবীর ম্যাপে কয়েক দানা সরষের মতো দেখায় এই দ্বীপপুঞ্জকে। যদি লক্ষ করো, তাহলে খুঁজে পাবে। মাত্র উনিশশো বাহাত্তর সনে মাহেতে ইণ্টার-ন্যাশনাল এয়ার-পোর্ট চালু হয়। রানী এলিজাবেথ এসে উদ্বোধন করেন এই বিমান-বন্দরটি।

একদিন প্রালেঁ আইল্যাণ্ডে গেছিলাম।

ওয়াটার-শিয়িংয়ে ভারী মজা

ছোট্ট প্লেনে করে। পাইলটকে নিয়ে ন'জন মাত্র বসতে পারে। মাহে থেকে উড়ে 'অনামা' দ্বীপের উপর দিয়ে গিয়ে বাঁয়ে লা-ডিগ আইল্যাণ্ড রেখে যখন ফাঁকা মাঠে নেমে পড়ল সুন্দর রঙ-করা প্লেনটা তখন দেখলাম মাত্র তেরো মিনিট লাগল। প্রালেঁ মাহে থেকে মাইল চল্লিশেক।

সেদিন বড়ই দুর্যোগ ছিল। বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। একটা ট্যাক্সি করে গিয়ে পৌঁছলাম প্রালেঁ গ্রামে সুন্দর নারকোল-বীথির মধ্যের, লালমাটির কাঁচা পথ দিয়ে। বৃষ্টি না হলে হেঁটে যেতে পারতাম সব দেখতে দেখতে।

সারা সকাল বেরোতেই পারলাম না। সমুদ্রের একেবারে উপরেই শোঁ-শোঁ হাওয়া আর উথাল-পাথাল জলের পাশের এক রেস্তোরাঁতে বসে পর্দার পতপত আওয়াজ শুনতে শুনতে ডায়েরি আর চিঠি লিখলাম।

দুর্যোগে আটকে পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু দুপুরের খাওয়ার পরে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে এল। হঠাৎই। তাই সাঁতার কাটলাম

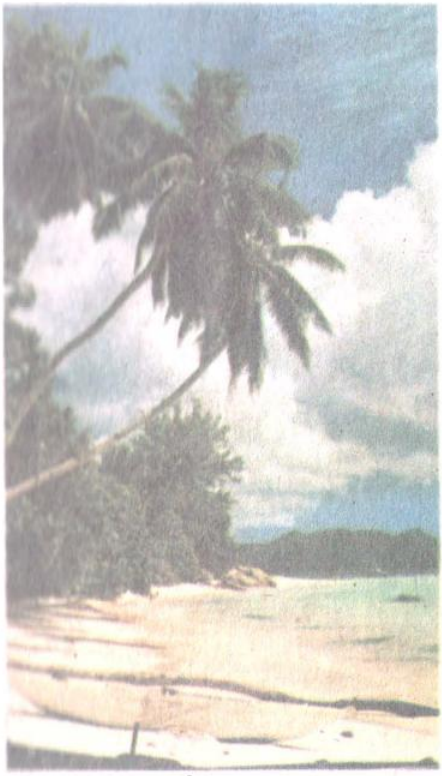

শান্ত নির্জন বেলাভূমি

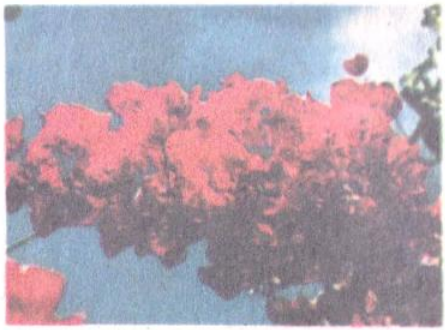

নীল আকাশ, লাল ফুল

বিকেলের সমুদ্রে অনেকক্ষণ। তারপর সেই নির্জন নারকোলবীথির মধ্যের লাল মাটির চওড়া পথ ধরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হেঁটে এলাম এয়ার-স্ট্রিপে। মাইল দেড়েকের মতো পথ। আবার প্লেন ধরে মাহেতে ফিরে এলাম। ভয়ে ভয়ে। মনে হচ্ছিল এতটুকু পাখির মতো প্লেন, যদি ধপ করে পড়ে যায় নীচে?

ইণ্টার-আইল্যাণ্ডার প্লেন অনেকগুলো আছে সেশেলসে। সবগুলোতেই ন'জন করে বসতে পারে। এয়ার মাহের অধীনে। তোমরা জেনে খুশি হবে যে, এই এয়ার মাহের চীফ পাইলট একটি ভারতীয় ছেলে। তার অধীনেই সব প্লেনগুলো। তার বাড়ি দিল্লিতে।

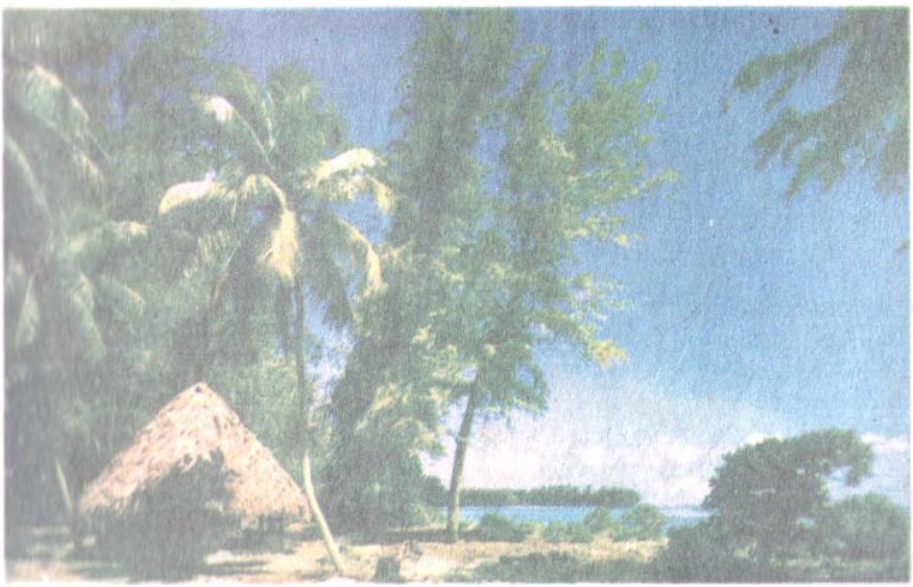

# তাপ্পিদার সাপ শিকার

**হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়**

তাপ্পিদা চেয়ারের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে বলল, "দূর, বাঘভালুক শিকার আবার শিকার নাকি? ও তো বাচ্ছারাও পারে। ভালুকের বিরাট চেহারা। গুলি করলে ফস-কাবার উপায় আছে। ঠিক পায়ে গিয়ে লাগবে। আর বাঘ শিকার? গাছের তলায় ছাগল বেঁধে বাবুরা গাছের মগডালে গিয়ে উঠলেন। বেচারি বাঘ যখন ছাগল চিবোতে ব্যস্ত, তখন পাতার আড়াল থেকে দড়াম করে গুলি। কী বীরত্ব!

"সেরা শিকার হচ্ছে সাপ শিকার। সাপের অগম্য জায়গা নেই। জলে, স্থলে, হাফ-অন্তরীক্ষে এদের অবাধ বিচরণ। হাফ-অন্ত-রীক্ষ মানে গাছের উঁচু ডাল পর্যন্ত। বহু সরু জাতের সাপ আছে। চোখ একটু খারাপ থাকলে তাদের দেখাই যায় না। গাছের ডালের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে থাকে যে তাদের গায়ের ওপরই বন্দুক রেখে তুমি বসে আছ।

"আর বিরাট আকারের পাইথন সাপও আছে। তাদের আবার গুলিতে ঘায়েল করা যায় না। তুমি গুলি ছুঁড়লে, আর দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ের মতন ফণা দিয়ে হেড করে সেই গুলি তোমার দিকেই ফেরত পাঠাল।

"পাইথন মারার নিয়ম হচ্ছে," তাপ্পিদা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "না থাক এসব মন্ত্রগুপ্তি সকলকে জানানো ঠিক হবে না।"

পাড়ার ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তাপ্পিদাকে ঘিরে ধরল, "তাপ্পিদা তোমার সাপ শিকারের দু-একটা কাহিনী বলো।"

"বলব? তাহলে গোকুলকে বল, এক কাপ চা আর একটা টোস্ট দিতে।"

চা আর টোস্ট এল। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে তাপ্পিদা বলতে শুরু করল।

"বছর পাঁচেক আগের কথা। রাজস্থানে গিয়েছি সাপের সন্ধানে। মরুভূমিতে একরকম সাপ আছে, তার রঙ একেবারে বালির মতো। কিছু তফাত টের পাওয়া যায় না। কোনোরকমে নাগালের মধ্যে গেলে আর দেখতে হবে না। একেবারে সাক্ষাৎ শমন। এক ছোবলেই মাথায় বিষ উঠে যাবে। ওঝা, ডাক্তার কেউ কিছু করতে পারবে না।

"তাই খুব সাবধানে বালির দিকে চোখ রেখে চলেছি। হাতে বন্দুক। মাথার ওপর কড়া রোদ, পায়ের নীচে গরম বালি। সর্বাঙ্গ

ঘামে ভিজে গেছে। তেষ্টায় তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। আর চলতে পারছি না। একটু জল না পেলে প্রাণে বাঁচব না।

"হঠাৎ দেখতে পেলাম খেজুর গাছে ঢাকা একটা ডোবা, চারপাশে কিছু সবুজ ঘাসও রয়েছে। তার মানে, ওয়েসিস, বাংলায় যাকে বলে মরুদ্যান।

"ডোবা দেখে আর জ্ঞান ছিল না। ছুটে সেখানে গেলাম। বন্দুকটা ঘাসের ওপর রেখে দেখলাম, বিরাট একটা তালগাছের কিছুটা ডাঙা থেকে জলের মধ্যে ডোবানো!

"বোধহয় গ্রামবাসীরা জল নেবার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে। ডোবার জল একটু সবুজ, কিন্তু আমার তখন এত তেষ্টা পেয়েছিল যে কাদাগোলা জল খেতেও আমি রাজি ছিলাম। কোমরের ছোরাটা তাল-গাছের মধ্যে গিঁথে সাবধানে নেমে গেলাম। রুমাল ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল খেলাম। আঃ, প্রাণটা যেন বাঁচল।

"আবার পা টিপে টিপে এসে ছোরাটা উঠিয়ে নিয়েই চমকে উঠলাম। ছোরার মুখটা রক্তে লাল আর একটু একটু করে তালগাছটা ডোবার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা তালগাছ নয়, পাহাড়ি অজগর। ছুটে ওপরে এসে প্রাণপণ শক্তিতে ছোরার ঘা বসালাম। বোধহয় বার সাতেক। "ডোবার জলে যেন সমুদ্রের ঢেউ উঠল। জলের ছিটে খেজুর গাছের মাথায়। চারপাশের মাটি কেঁপে উঠল। অজগর ডোবার জলে ডুবে গেল।"

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

"বলো কী তাম্পিদা, এই সাইজের অজগর আছে?"

তাম্পিদা মুচকি হেসে বলল, "এ পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি।"

সবাই আবার চেঁচাল, "আর একটা এ-রকম বিপদের কাহিনী বলো তাম্পিদা।"

তাম্পিদা অমায়িক হাসল, "আমার জীবনটাই তো বিপদের সঙ্গে কোলাকুলি ভাই। শোনো তবে আর একটা ঘটনা। তার আগে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে। এক কাপ চা।"

চা এল।

কাপে চুমুক দিতে দিতে তাম্পিদা বলল, "সেটা বোধহয় ঘাটশিলা কিংবা ঝাড়গ্রাম হবে। ঝাড়গ্রামেই বোধহয়। বন্দুক কাঁধে সাপের খোঁজে চলেছি। তিনদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরছি, সাপের খোলসেরও দেখা নেই। আমি যে এখানে আসব সেটা কাক-পক্ষীরও জানা ছিল না, সাপেরা টের পেল কী করে। সব সরে পড়েছে।

"ঘন কাঁটা-বন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে শজারুর মতন কাঁটা। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে কাঁটা-ঝোপের ওপর গিয়ে পড়লাম। মুখটা বেঁচে গেল, কিন্তু একটা পা কাঁটার ঘায়ে রক্তাক্ত। ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

"একবার ভাবলাম, রুমাল দিয়ে পা-টা বাঁধি, কিন্তু তাহলে রুমালটা যাবে। বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম যদি চওড়া কোনও পাতা কিংবা গাছের ছাল পাই।

"বরাত ভাল। হলদে রঙের একটা কাপড়ের পাড় পেয়ে গেলাম। বোধহয় বনভোজনের জন্য কেউ হাঁড়িকুড়ি বেঁধে এনেছিল। যাবার সময় ফেলে গেছে।

রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটা গাছতলায় বসে কৌটো খুলে লুচি আর তরকারি খাচ্ছি, হঠাৎ পা-টা শিরশির করে উঠল।

"ভাবলাম আবার বুঝি রক্ত পড়ছে। চোখ ফিরিয়ে দেখেই চক্ষুস্থির। পাড়ের একটা কোণ থেকে চেরা জিভ দেখা যাচ্ছে। বাঁধনটা মোক্ষম হয়েছে বলে ছোবল দেবার সুবিধা পাচ্ছে না। একটু একটু করে পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে আসতে বুঝতে পারলাম এবার বিপদে পড়ব।

"চিতি সাপ। নিশ্বাসে মৃত্যু। কিছু একটা আমায় করতেই হবে। আস্তে আস্তে কোমর থেকে ছোরাটা বের করে চট করে সাপের মাথাটা দুখণ্ড করে ফেললাম। মাথা কাটা যাবার পরও দেহটা নড়তে লাগল। পায়ে পায়ে জড়ান বাঁধনটা খুলে ফেলে তবে নিষ্কৃতি পেলাম।"

তাম্পিদা চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। সেদিনের বীভৎস অবস্থাটা যেন নতুন করে অনুভব করছে।

ছোটন বলল, "আচ্ছা তাম্পিদা, এটাই বোধহয় তোমার সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা সাপ সম্বন্ধে, তাই না?"

তাম্পিদা মাথা নাড়ল, "মারাত্মক অভিজ্ঞতার কথা যদি তুললে, তাহলে বলব সেরাই-

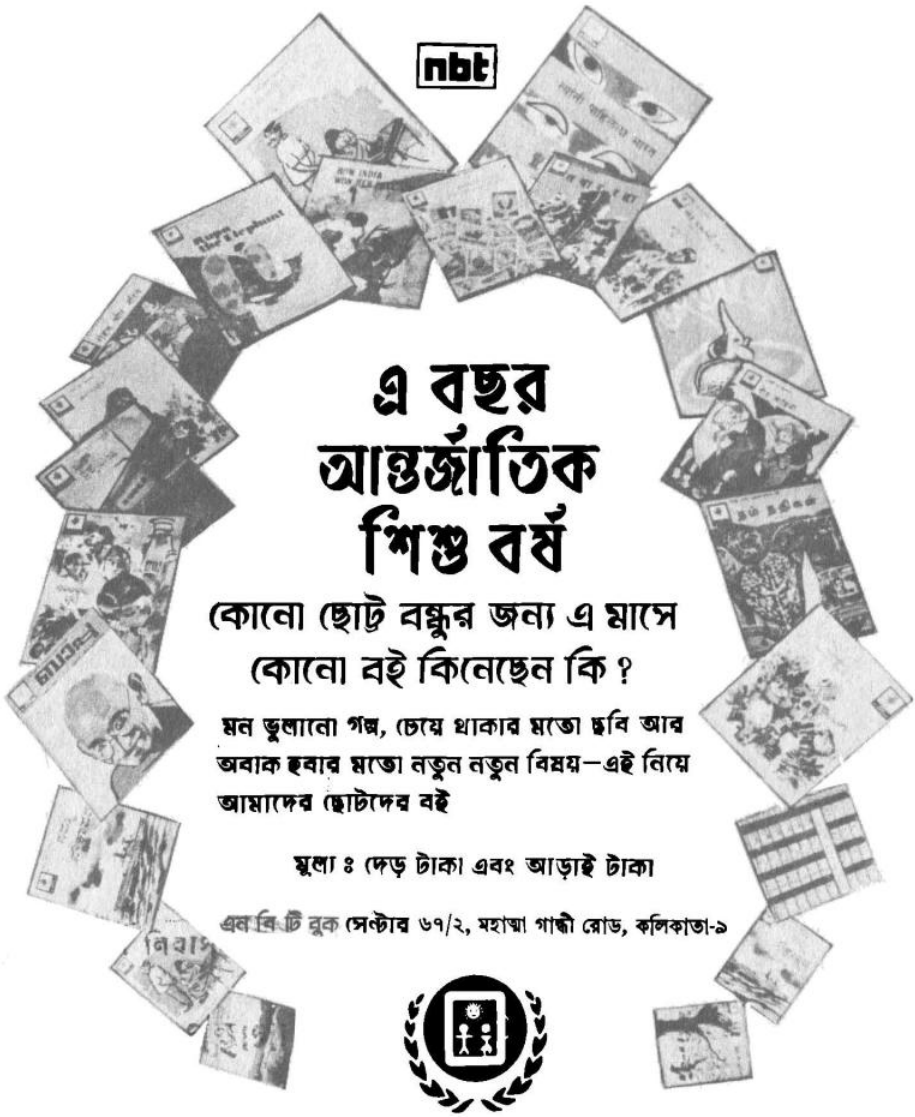

nbt



# এ বছর আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ

## কোনো ছোট্ট বন্ধুর জন্য এ মাসে কোনো বই কিনেছেন কি ?

**মন ভুলানো গল্প, চেয়ে থাকার মতো ছবি আর অবাক হবার মতো নতুন নতুন বিস্ময়—এই নিয়ে আমাদের ছোটদের বই**

**মূল্য ঃ দেড় টাকা এবং আড়াই টাকা**

এন বি টি বুক সেন্টার ৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

অন্যান্য যাদের কাছে আছে

**ষ্টার বুক হাউস** ৬৫-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **উদ্রা·পাবলিশিং হাউস** ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭২ ● **ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স** ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **সিনহা বুক এজেন্সী** ৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী** ২২, রাজা উডমান্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১ ● **চৌধুরী সেলস কনসার্ন** তিনকোনিয়া, বর্দ্ধমান ● **সেলস এম্পোরিয়াম, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন** ৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১

# ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

কেল্লার ডাকবাংলোয় যা হয়েছিল, তার তুলনায় এসব তো ছেলেখেলা।”

“কী-রকম? কী-রকম?” সবাই ঘিরে ধরল।

“সে আর একদিন বলব।” তাপ্পিদা ওঠবার চেষ্টা করল।

“আরে না, না। আর একদিন কেন? আজই হোক। বরং আর এক কাপ চা বলছি।”

চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তাপ্পিদা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, “ঘটনাটা মনে হলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। রাউরকেল্লা হয়ে সেরাইকেল্লা গেছি ওই সাপের সন্ধানে। চারদিকে ঘন বন। সূর্যের আলো পর্যন্ত আসে না। সন্ধ্যা ছটা বাজলেই নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যায়।

“দরোয়ানটা বলেছিল, সাব, রাতে আলো নেভাবেন না, আর মশারি ফেলে শোবেন। আলোটা জ্বালিয়েই শুই, কিন্তু মশারি ফেলে শুতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই মশারিটা তোলাই থাকে।

“মাঝ-রাতে হঠাৎ দেহে শীতল একটা স্পর্শ লাগতেই চমকে জেগে উঠেছিলাম। চোখ খুলেই দেখি পাশে একেবারে স্বয়ং যম। চন্দ্রবোড়া। বিরাট ফণা তুলে আমার বিছানার ওপর। জানলা দরজা বন্ধ। নিশ্চয় নর্দমার গর্ত দিয়ে ঢুকেছে।

“আমার বন্দুকটা দেয়ালে ঝোলানো। ছোরা টেবিলের ড্রয়ারে। নখ ছাড়া সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। উপায়? উঠে ছোরা কিংবা বন্দুক আনতে গেলেই খতম হয়ে যাব। চুপচাপ মড়ার মতন পড়ে থাকতে হবে। সেভাবেই বা কতক্ষণ বাঁচব জানি না। চন্দ্রবোড়ার মার্বেলের মতন দুটি চোখ মনে হল আমার ওপর। ফণাটা এদিক থেকে ওদিকে দুলছে। ছোবল মারার আগের অবস্থা।

“মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে নস্যির কৌটোটা বের করে নিলাম। দারুণ কড়া নস্যি।

“আচমকা কৌটোটা খুলে সব নস্যি উপুড় করে দিলাম চন্দ্রবোড়ার মুখের ওপর। অনেকে বলে সাপের নাক নেই। একেবারে বাজে কথা। নস্যি উপুড় করায় সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার হাঁচি শুরু হল। গুনে গুনে একত্রিশটা হাঁচি। প্রত্যেকটি হাঁচির সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার মুখ থেকে [illegible] লাগল।

“প্রথমে রঙ গাঢ় নীল, তারপর ক্রমে ক্রমে ফিকে হতে লাগল। শেষদিকে জলের মতো রঙ। তার মানে বিষ শেষ, এবার [illegible] উঠছে।

“আর দেরি করিনি। চন্দ্রবোড়ার [illegible] মুঠোর মধ্যে ধরে আছাড়ের পর আছাড়। বার কয়েক আছাড় মারতেই দড়ির মতো সোজা হয়ে গেল।”

হঠাৎ তাপ্পিদা নিজের হাতঘড়ির দিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, “সর্বনাশ, বারোটা বেজে গেছে। আজ খাওয়া মিললে হয়।”

তাপ্পিদা পাশে রাখা সাইকেলে উঠে পড়ল।

# অসাধারণ বালক

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ। ইতালির সেই বিখ্যাত শহর পিসা, যেখানে একটি টাওয়ার শত-শত বছর ধরে একদিকে একটু হেলে দাঁড়িয়ে আছে—আর তাই দেখতে আজও আসছে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে। পিসার বিশাল গির্জার ভিতরে বসে বসে একটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছে। এমন ঘটনা আরও কত-জনের চোখের সামনে অহরহ ঘটে থাকে, কিন্তু কে আর তা লক্ষ করতে যায়। ছেলেটিও একটু অদ্ভুত ধরনের, আর পাঁচজনের মতো নয়।

সে দেখল, গির্জার ঝুলন্ত বাতিগুলো হাওয়ায় দুলছে, কখনো বেশি, কখনো কম। জোরে হাওয়া এলে বাতিগুলোকে বেশিদূর দুলিয়ে দিচ্ছে, কম হাওয়া এলে কম দূর। আশ্চর্য ব্যাপার, যা ছেলেটি লক্ষ করল, তা হচ্ছে বাতিগুলো হাওয়ায় দুলে বেশি দূরেই যাক, আর কম দূরেই যাক, ঠিক জায়গায় ফিরে আসতে তার সময় লাগছে একই। এই থেকে আবিষ্কার হল একটি অতি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। শুধু ঘড়ি তৈরিতেই নয়, আরও কত ভাবে যে এর প্রয়োগ, তা বলে শেষ করা যায় না।

তত্ত্বটির নাম পেন্ডুলাম তত্ত্ব। আর ছেলেটি? গ্যালিলিও।

বলো না মা, তোমার চুল
এত সুন্দর কেমন করে হল?

ছোট বেলা থেকে আমরা
চুলের যত্ন নিতে শিখেছিলাম। ছুটির দিন ছাড়া
রোজ রাতে শুতে যাবার আগে ভাল করে
জবাকুসুম মেখে চুল বেঁধে শুতে যেতাম তাতে
চুলও ভাল থাকতো, ঘুমও ভাল হত।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা নিউ দিল্লী

# কে?

## বিমল মিত্র

**আগে যা ঘটেছে :** জয়রামবাবুর মাতৃহারা ছেলে জ্যোতি পার্কে হারিয়ে গেছে। বড়লোক-বাবার বাড়ি-পালানো, অভিমানী, একগুঁয়ে ছেলে চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মথুরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে জয়রামবাবুর বাড়িতে যে প্রায়-বেহুঁশ ছেলেটিকে নিয়ে এসেছে পুলিস, সে-ই কি জ্যোতি? পুলিসের সঙ্গে জয়রামবাবু থানায় চলেছেন। অতঃপর....

॥ ৭ ॥

পুলিসের দারোগার সঙ্গে জয়রামবাবু থানায় গেলেন। বড়বাবুকে দেখে যে যেখানে ছিল সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। বড়বাবুর হুকুমে হাজত-ঘরের দরজা খোলা হতেই দেখা গেল একটা লোক ঘরের এক কোণে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। জয়রামবাবু আর বড়বাবু সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটা জুতোর শব্দ শুনে চোখ খুলল।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—"অ্যাই, ওঠ্ ওঠ্—"

লোকটা উঠে দাঁড়াল। আর পিট-পিট করে চাইতে লাগল দুজনার দিকে। তার পরনে সাদা ময়লা প্যান্ট, গায়ে চিট-ময়লা কালো কোট। আর পায়ে একটা ছেঁড়া চটি। দেখে বোঝা গেল পুলিস তাকে খুবই মেরেছে। মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

জয়রামবাবুর ভারী দুঃখ হল লোকটার দশা দেখে। আবার রাগও হল খুব। এই লোকটাই কিনা তার ছেলের এই দশা করেছে! জয়রামবাবুর মনে হল লোকটার বয়েস হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন।

জয়রামবাবু লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই আমার ছেলেকে চুরি করেছিলে?"

লোকটা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—"

"কেন চুরি করলে? আমি, কী ক্ষতি করেছিলুম?"

লোকটা কিছু জবাব দিলে না। দারোগা-বাবু তার হাতের রুলটা দিয়ে লোকটার বুকে জোরে একটা গুঁতো মারলে। বললে, "বল কেন এঁর ছেলেকে তুই চুরি করেছিলি? বল শিগগির—"

লোকটা কেঁদে ফেললে। বললে, "আমি অনেকদিন কিছু খেতে পাইনি।"

"তা কিছু খেতে পাসনি বলে পরের ছেলেকে তুই চুরি করবি? ছেলেটাকে দিয়ে পয়সা উপায় করবার মতলব ছিল তোর?"

লোকটা ভয়ে ভয়ে বলে ফেললে, "আমি অন্যায় করেছিলুম বাবু।"

দারোগাবাবু বললে, "তোকে এর জন্যে জেল খাটতে হবে, জানিস? তোকে কোর্টে হাকিমের কাছে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।"

লোকটা এবার কেঁদে ফেললে। "আমাকে জেলে পাঠাবেন না হুজুর। আমি জেলে গেলে মার খাব।"

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে, "আগে আর কতবার জেল খেটেছিস?"

"পাঁচবার।"

"কেন জেল খেটেছিস?"

"ছেলে চুরি করবার জন্যে।"

বলে লোকটা দারোগাবাবুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলতে লাগল, 'আমাকে মাফ করুন দারোগাবাবু, আমি আর কক্ষনো এমন কাজ করব না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। আমার নিজের ছেলে থাকলে তাকে দিয়েই এ কাজ করতুম, পরের ছেলে চুরি করতে হত না।"

"তুই কোথায় থাকিস? তোর ঠিকানা কী?"

"আমার হুজুর কোনও ঠিকানা নেই। আমি বর্মা থেকে কলকাতায় এসেছি। সেখান থেকে এখানে হাঁটা-পথে আসবার সময় আমার বউ ছেলে-মেয়ে সবাই মারা যায়। এখানে এসে অনেক চাকরির চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ আমাকে চাকরি দেয়নি। আমি না খেতে পেয়ে শেষকালে এই পথ ধরেছিলাম।"

জয়রামবাবু বললেন, "তা এত ছেলে থাকতে আমার ছেলেকে চুরি করতে হয়? আমার যে ওই একই ছেলে।"

লোকটা এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

দারোগাবাবু বললে, "তুই বেটা বড়

ধড়িবাজ। আবার চিঠি লিখে রেখে এসেছিলি কেন?"

লোকটা বললে, "আমার ইচ্ছে ছিল আমি ওকে নিয়ে অন্য কোনও দেশে চলে যাব। কেউ আমাকে সেখানে চিনতে পারবে না তাহলে।"

"কিন্তু গেলি না কেন?"

"আমার পকেটে কোনও টাকা-পয়সা ছিল না। ভেবেছিলুম পরে কিছু পয়সা জমলে তারপর যাব। কিন্তু আজকাল কেউ ভিক্ষে দিতে চায় না। কারোর আর আগেকার মতো টাকা-কড়ি নেই। আর যাদের টাকা-কড়ি আছে তারা তো হেঁটে যায় না, গাড়িতে যায়। তাই আমদানি বেশি হত না আমার।"

জয়রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তা তুমি ওকে কী খাইয়েছ? ও তো নিজের নামও বলতে পারে না। একেবারে সব ভুলে গেছে।"

লোকটা বললে, "আমি ওকে আফিম আর কোকেন খাওয়াতুম। যাতে ও সব ভুলে যায়।"

"কী সর্বনাশ!" জয়রামবাবু আঁতকে উঠলেন। দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জ্যোতি বাঁচবে তো?"

দারোগাবাবু বললে, "আপনি আপনার ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যান। এখন থেকে নিজের কাছেই ওকে রাখুন। তারপর ভাল ডাক্তারকে দিয়ে ওর চিকিৎসা করান। ভগবানের ওপরই সব ভার ছেড়ে দিন। এর চেয়ে বেশি আমি আর কী বলতে পারি। আমি এ ব্যাটাকে যা করবার তা করছি—"

জয়রামবাবু পুলিসের গাড়িতে করেই জ্যোতিকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কর্তামশাইকে দেখে ভৈরব কৈলাস গোপাল আর ঠাকুর- সবাই দেখতে এল।

জয়রামবাবু সকলকে ডাকলেন। বললেন, "আয়, সবাই মিলে একে গাড়ি থেকে নামা। খুব সাবধানে নামাবি। ধরে নিয়ে একে দোতলায় আমার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিবি।"

সবাই তাই-ই করলে। সকলেই অবাক হয়ে গেল খোকাবাবুর চেহারা দেখে। চুল ছোট করে ছাঁটা, রোগা, গায়ের রঙ কালো হয়ে গেছে। সেই খোকাবাবুর এ কী চেহারা হয়েছে। এ যে একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।

সবাই খোকাবাবুকে ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিলে। খোকাবাবু সকলের দিকেই ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল।

জয়রামবাবু মাথা নিচু করে জ্যোতির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খাবে বাবা? খিদে পেয়েছে?"

জ্যোতি মাথা নাড়লে। বললে, "হ্যাঁ।"

"কী খাবে? কী খেতে ইচ্ছে করছে? দুধ খাবে?"

জ্যোতি আবার মাথা নেড়ে বললে, "হ্যাঁ"

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ছুটল রান্নাঘরের দিকে। দুধ গরম করে নিয়ে এল। জয়রামবাবু গেলাসটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "একটু উঠে বোসো। দুধটুকু খেয়ে নাও—"

জ্যোতি আস্তে আস্তে নিজের চেষ্টাতেই উঠে বসল। জয়রামবাবু নিজেই গেলাসটা তার মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। জ্যোতি এক চুমুকে সমস্ত দুধটা খেয়ে নিয়ে আবার বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল।

ডাক্তারবাবুকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসে পড়লেন। তাঁকে সব খুলে বললেন জয়রামবাবু। অনেকক্ষণ ধরে তিনি ছেলেকে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "এর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। তা না হলে ঠিক চিকিৎসা করা যাবে না—"

জয়রামবাবু বললেন "একে তিন-চার মাস ধরে কেবল আফিম আর কোকেন খাইয়ে এই অবস্থা করিয়ে দিয়েছে। এখন যা করার দরকার তা করুন। আমার একমাত্র ছেলে এ, এই-ই আমার সব-কিছু, একে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে যত টাকা লাগে লাগুক আমি খরচ করব। আপনি যে-ওষুধ খেতে বলবেন তাই-ই খাওয়াব। দরকার হলে বিদেশ থেকেও ওষুধ আনতে গেলে যা করা দরকার তা করুন এর জন্যে। একে বাঁচিয়ে তোলা চাই-ই চাই—"

তা তাই-ই চলতে লাগল। এবেলা-ওবেলা ডাক্তারবাবু আসতে লাগলেন। যে খাবার খেতে দিতে বললেন সেই খাবারই দেওয়া হতে লাগল। টাকা খরচের কোনও কমতি করলেন না চাটুজ্জে-মশাই। একমাত্র ছেলে বলে কথা! ছেলেই যদি না-বাঁচল তাহলে তাঁরই বা এত টাকা নিয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ?

মুখুজ্জেমশাইরাও দেখতে এল।

মুখুজ্জেমশাই বললে "এ কী, জ্যোতিকে যে আর চেনাই যায় না একেবারে!"

জয়বাবু বললেন, "কী করে চেনা যাবে বলুন। যখনই খেতে চেয়েছে সে-ব্যাটা কেবল আফিম আর কোকেন খাইয়ে বেহুঁশ করে দিয়েছে! নইলে আমার ছেলেকে দিয়ে কিনা রাস্তার ফুটপাথে ভিক্ষে করিয়েছে!"

মুখুজ্জেমশাই বললে, "তবু ভাগ্যি ভাল যে কলকাতায় ছিল। কলকাতা ছেড়ে যদি অন্য কোনও দেশে উধাও হয়ে যেত তাহলে তো আর এর পাত্তা পাওয়া যেত না। ভগবান বাঁচিয়েছেন। আপনি কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসুন। আর দেরি করবেন না।"

জয়রামবাবু তাই-ই করলেন। চিকিৎসা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। জয়রাম-বাবু কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন। স্যাকরাকে ডেকে মা-কালীর সোনার জিভ গড়িয়ে দিলেন।

বিনয় খবর পেয়ে একদিন এল। সেও দেখতে এল। বিছানার কাছে গিয়ে ডাকল, "জ্যোতি—"

জ্যোতি চোখ তুলল।

বিনয় বললে "আমাকে চিনতে পারো?"

জ্যোতি ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল মাস্টারমশাইয়ের দিকে।

"আমি তোমার মাস্টারমশাই। আমাকে মনে পড়েছে?"

জ্যোতি কোনও কথারই জবাব দিলে না।

চলে যাবার সময় বিনয় জয়রামবাবুকে বললে, "এ কী চেহারা হয়েছে জ্যোতির, একে-বারে চেনাই যায় না।" জয়রামবাবু বললেন, "তবু ভগবানকে ধন্যবাদ যে এতদিন পরে ওকে খুঁজে পাওয়া গেছে। নইলে কী হত বলো দিকিনি!"

ওদিকে আর-একটা হাসপাতালে আর-এক জ্যোতি তখন বিছানায় শুয়ে আছে একলা। পাশেই একটা জানলা। জানলা দিয়ে বাইরের

মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে বিছানার ওপর। সে বাইরের আকাশটার দিকে চেয়ে দেখছিল। পরিষ্কার আকাশটায় তখন অনেক উঁচুতে কয়েকটা চিল ঘুরে ঘুরে উড়ছে। তারপর নীচের দিকে দুটো উড়ন্ত ঘুড়ি পরস্পরকে প্যাঁচে জড়াবার চেষ্টা করছে। বেশ মজা লাগছিল তার। একটু আগেই সিসটার এসে তাকে দুধ আর টোস্ট খাইয়ে গিয়েছে।

খানিক পরে সিসটারের সঙ্গে ডাক্তারবাবু ঢুকলেন। রোগীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ আজকে খোকা।"

জ্যোতি মাথা নেড়ে জানাল, "ভাল।"

ডাক্তারবাবু সিসটারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "টেমপারেচারের চার্টটা দেখি—"

টেমপারেচারের চার্ট দেখে আবার সেটা সিসটারের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। সবই স্বাভাবিক। শরীরের কোথাও কোন গলদ নেই। ছোট হাসপাতাল থেকে এখানকার বড় হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে রোগীকে। প্রথম দিকে জ্বর হত রোগীর। মাথার ঘা-টাও শুকিয়ে গেছে। ওর সঙ্গে অন্য যে-সব রোগী এখানে এসেছিল তাদের অনেক-দিন আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু এই ছেলেটিকে এখনও রেখে দেওয়া হয়েছে। সে কিছু বলতে পারে না। তার কোথায় বাড়ি, তার বাড়িতে বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ আছে কিনা তাও সে জানে না।

ডাক্তার অন্যদিনের মতো সেদিনও জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

রোগী চুপ করে রইল। খানিক পরে বললে, "আমি জানি না।"

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দেশ কোথায়?"

রোগী বললে, "আমি জানি না।"

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কে?"

রোগী বললে, "আমি জানি না।"

"তুমি কে তাও জানো না? ভাল করে মনে করতে চেষ্টা করো। আমি আবার কাল এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করব। ভেবে বলবে তুমি কে? বুঝলে?"

ডাক্তারাবু চলে গেলেন।

সে তখন একমনে ভাবতে লাগল, আমি কে? কে আমি? সত্যিই তো, আমি কে?

(ক্রমশ)

# বিজ্ঞানের টুকিটাকি

## প্রদীপকুমার দত্ত

প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে পরিবেশের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রাণী নিজেকে কিছুটা খাপ খাইয়ে নিতে পারলেও তার একটা সীমা আছে। কিন্তু কত বিচিত্র পরিবেশে যে জীবাণুরা বেঁচে থাকতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। কিছু কিছু জীবাণু যে শুধু তরল নাইট্রোজেনের তাপ-মাত্রায় (—১৯৫° সেন্টিগ্রেড) বেঁচে থাকতে পারে তাই নয়, এত কম তাপমাত্রাতেও তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। কয়েকটি জীবাণুর মধ্যে দিয়ে তীব্র প্রবাহিত হলেও তাদের ওপর

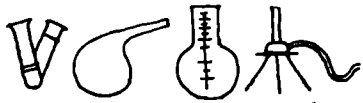

কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, যদিও ঐ তড়িৎ উচ্চ শ্রেণীর কোনো প্রাণীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণও এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিছু কিছু জীবাণু উষ্ণ প্রস্রবণে, যেখানে তাপমাত্রা প্রায় ৭০° থেকে ১০০° সেন্টিগ্রেড, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। কিছু জীবাণু আবার দক্ষিণ মেরুর বরফের ৩০ মিটার নীচে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

*

জল না পেলে গাছ বাঁচে না। কিন্তু দেখা গেছে যে, গাছ যে পরিমাণ জল গ্রহণ করে তার খুব কম অংশই সে নিজের কাজে লাগায়। বাকি সব জলই সে বাষ্পাকারে ত্যাগ করে। ভুট্টা গাছ ২৩৪ লিটার জল গ্রহণ করে তার মাত্র ৩ লিটার সে কাজে লাগায়, বাকি ২৩১ লিটারই বাষ্পাকারে ত্যাগ করে।

*

আমরা এতদিন জানতাম যে, সাপেরা শুনতে পায় না। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাপেরা কয়েকটি ক্ষেত্রে শুনতে পায়। খুব ক্ষীণ সঙ্গীত কিছু কিছু সাপের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে সঙ্গীতে মানুষ বা অন্য প্রাণী যেমন মুগ্ধ হয়, সাপেরা তেমন হয় না। বরং তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# রোভার্সের রয়

আরে, মাঠে কি সিনেমা দেখানো হবে নাকি ?
হ্যাঁ, হবে !

আমেরিকায় এই ব্যবস্থা আছে !

কীভাবে হয় এটা ?
VIDEO TV
এখুনি জানতে পারবে !
শুরু করো রয় !

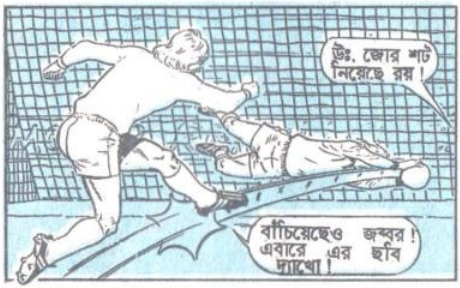
উঃ, জোর শট নিয়েছে রয় !
বাঁচিয়েছেও জন্বর ! এবারে এর ছবি দ্যাখো !

দেখছ ?
সাবাশ !
বাপস্ !

ভাবছি, সামনের ম্যাচের পরে সমর্থকদের এটা দেখাব !
ম্যাচের বড়-বড় ঘটনাগুলোকে তারা আবার দেখতে পাবে !

এবং দেখতে পেয়ে খুশি হবে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পেলে ?
নাঃ, কাউকে দেখছি না !
মড়াত
ভয় নেই···একটা পচা ডাল···আমি ঠিকই আছি !
আমি ঠিক নেই !
কেউ নেই ! নেমে আসছি !
ক্যাপ্টেন, ডাইনে তাকাও, আরও ডাইনে !
আরে, এ যে ক্যালকুলাসের ছাতা !
কী ব্যাপার বলো তো ?
তাই তো !
ঘাস দেখে মনে হয়, ধস্তাধস্তি হয়েছিল !
ডালপালাও ভাঙা !
হুম্, ব্যাপার সুবিধের নয় !
মনে হচ্ছে, ক্যালকুলাস এখানে আসতেই গাছ থেকে আততায়ী তাঁর উপরে লাফিয়ে পড়ে !
কিন্তু কেন ? ক্যালকুলাসকে আক্রমণ করবার অর্থ কী ?
কী জানি ! আমি শুধু এইটুকু জানি যে, নিখোঁজ ক্যালকুলাসকে খুঁজে বার করতে হবে !
কুট্রুস ! কুট্রুস !
কুট্রুস ! কুট্রুস !
খেলা ছেড়ে এখন ক্যালকুলাসকে খুঁজে বার করো !
যেভাবেই হোক, খুঁজে বার করতে হবে !

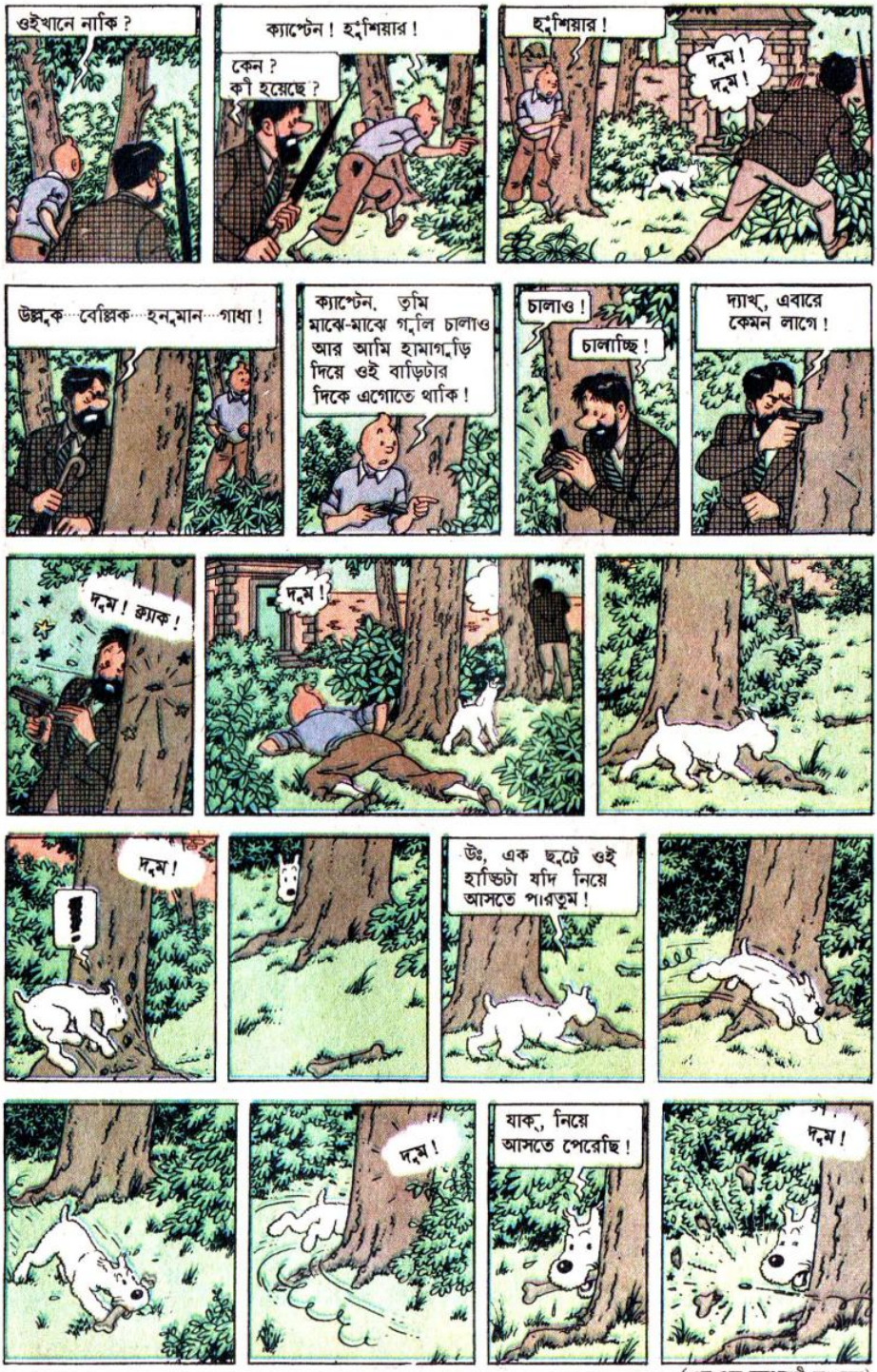




(এর পর আগামী সংখ্যায়)

১৯৬৬
ইংল্যান্ডে এবারে দারুণ সমারোহে বিশ্বকাপের আসর বসেছে!

# ইংল্যাণ্ড

হঠাৎ শোনা গেল, বিশ্বকাপ চুরি হয়ে গিয়েছে!

DAILY
WORLD CUP STOLEN

শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দক্ষতায় কাপ উদ্ধার হয়। সেই সূত্রে বিখ্যাত হয়ে যায় পিকলস নামে একটি কুকুর।

66/4

নরওয়ে ও যুগোস্লাভিয়াকে হারিয়ে ফ্রান্স প্রথমে বাহবা পেয়েছিল। কিন্তু....

ইংল্যান্ডের কাছে পরাস্ত হয়ে তারা দেশে ফিরে আসে।

66/5

4-2-4
খেলার ছক এখন অন্যরকম

পুরনো ছকে খেলার জন্য ফ্রান্সের ম্যানেজার দেশে ফিরে নিন্দিত হন

কেউ তাঁকে সমর্থন করেনি।

টি-ভির চাহিদা ইতিমধ্যে দারুণ বেড়েছে!

66/6

পশ্চিম জার্মানি সেবারে খুব শক্তিশালী দল। প্রধান খেলোয়াড় সীলার ছাড়াও জার্মান দলে সেবারে ছিলেন তরুণ বেকেনবাউয়ার।

পর্তুগাল টীমে আছেন ইউসেবিও। তবে....

তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া হাঙ্গারির নামডাকও তখন কম নয়।

66/8

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# দোস্তির টান

শান্তনু দাস

মামা যাবে বাঘ মারতে
নৌকো হল বাঁধা,
ঝুনাই, ফুচাই, ভটকুলেরও
লাগল কেমন ধাঁধা!
পাশের ঘরে দুপুর রাতে
যদি ইঁদুর ছোটে
ওরা জানে, মামার তখন
কপালে চোখ ওঠে।
সেই মামারই দেরাজভর্তি
পদক আছে ঢের,
এর পেছনেও গল্প আছে
ব্যাঘ্র শিকারের।
উলটো ছিল দোনলাটা,
করল তাকে সোজা।
বললে মামা, বাঘ যে কী চীজ
এত সহজ বোঝা!
মামা গেল একা একাই
আমরা ভয়ে চুপ,
নৌকো দোলে গলুই সমেত
রাত্তির নিশ্চুপ।

চোখের পাতাও পড়ছে না তো
পা কাঁপে ঠকঠক,
এমন সময় আওয়াজ এল,
'যেমন তোদের শখ।'
সাহস বটে বাদুড়ছানার,
বাঘের ঘরের সাথে!
প্রকল্পতে এল বলে
ছেড়ে দিলুম—রাতে।
দূরে দেখি—ও মা একা
বাঘের মুখে মামা—
বন্দুকেরই নলসুদ্ধু
দিচ্ছে যেন হামা!
ছেড়ে দিলেন বাঘবাবাজি
এ-যাত্রায় প্রাণ,
মামা এসে বলল, 'রে দ্যাখ
দোস্তির কী টান!
এলুম একটু দেখা করে
কত্তো আদর-যত্ন
বংশটা তো দেখতে হবে—
দখিন রায়ের রত্ন।'

ছবি দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

**আগে যা ঘটেছে:** কাকাবাবু আর সন্তু এবার অভিযানে গেছে হিমালয়ে এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। গোরখশেপ নামে একটা জায়গায় একটা পুরনো গম্বুজের মধ্যে ওরা ছিল, আর বাইরে তাঁবু খাটিয়ে শেরপা আর মালবাহকরা। কাকাবাবু একদিন রাত্রে গম্বুজের মাথা থেকে দুরবিন দিয়ে দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু দেখেছিলেন। একদিন তিনি সেখান থেকে সবাইকে নিয়ে এভারেস্টের দিকে আরও খানিকটা এগোতেই দেখলেন বরফের মধ্যে বড় বড় পায়ের ছাপ। শেরপা আর মালবাহকরা ইয়েতির মতন বিরাট কোনো প্রাণী দেখতে পেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। কাকাবাবু আর সন্তু আবার ফিরে এসে আশ্রয় নিল গম্বুজটার মধ্যে। একটু পরেই গম্বুজের লোহার দরজাটায় দুমদুম শব্দ হল। তারপর—

॥ ১০ ॥

দরজায় যত জোরে আওয়াজ হল, সন্তুর বুকের মধ্যে যেন তার থেকেও জোরে আওয়াজ হতে লাগল। এই বরফের রাজ্যের মধ্যে সে আর কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।

কাকাবাবু আর সন্তুর খাট যেখানে পাশাপাশি পাতা, সেখান থেকে গম্বুজের দরজাটা দেখা যায় না। কাকাবাবু বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আছেন, হাতে রিভলবার। তিনি গভীরভাবে কোনো-কিছু চিন্তা করতে বসেছেন যেন এই সাংঘাতিক সময়ে।

দরজার ওপর দুমদুম আওয়াজটা আরও বেড়ে গেল।

কাকাবাবু এবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ দেয়ার?"

কোনো উত্তর এল না। আওয়াজটাও হঠাৎ থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "লোহার দরজাটা বেশ শক্ত। সহজে কেউ ভাঙতে পারবে না। সন্তু, তুই গম্বুজের ওপরে উঠে দ্যাখ তো বাইরে কিছু দেখা যায় কি না।"

সন্তু বিছানায় শুয়ে পড়ার সময় জুতো খুলে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি জুতো পরে নিল আবার। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে গম্বুজের সিঁড়িতে পা দিতেই আবার দুমদুম শব্দ হল দরজায়।

সন্তু তরতর করে উঠে গেল ওপরে। জানলাটা দিয়ে ব্যগ্র হয়ে তাকাল বাইরে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। গম্বুজের ওপর থেকে ঠিক নীচের জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায় না।

সন্তু বেশ জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে? কে ওখানে?"

এবারও কোনো সাড়া নেই।

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজাটার কাছে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "উত্তর দিচ্ছ না কেন? কে দরজা ধাক্কাচ্ছ? পরিচয় দাও!"

এর উত্তরে দরজায় আবার দুমদুম শব্দ।

কাকাবাবু আবার বললেন, "কে, মিংমা? নোরবু? কে বাইরে?"

তবু কোনো সাড়া নেই।

কাকাবাবু দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়ে বললেন, "কে আছ। সরে দাঁড়াও! খুলেই আমি গুলি করব!"

ওপর থেকে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, খুলবেন না, খুলবেন না!"

কাকাবাবু দরজার মস্ত বড় ছিটকিনিটা ধরে এমনিই একটা শব্দ করলেন। যেন তিনি দরজাটা খোলার ভান করছেন। আসলে দরজাটা খুললেন না।

সন্তু তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তারপর কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "ওপর থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আমার মনে হয় নোরবু কিংবা মিংমা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে! না হলে এখানে আর অন্য মানুষ আসবে কী করে? আর কোনো মানুষ হঠাৎ এসে পড়লেই বা সাড়া দেবে না কেন?"

সন্তু থমথমে মুখে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। কাকাবাবু এখনো কোনো মানুষের কথা ভাবছেন? এ তো ইয়েতির কাণ্ড! সন্তু নিজের চোখেই তো ইয়েতির ছায়া দেখেছে। ইয়েতি দরজা ভেঙে গম্বুজের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। সন্তুর শরীরটা এত কাঁপছে যে কিছুতেই সে নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না।

কাকাবাবু আরও কয়েকবার ইংরেজি.

# জেমসের মজার আসর

## ১০০১টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি ?

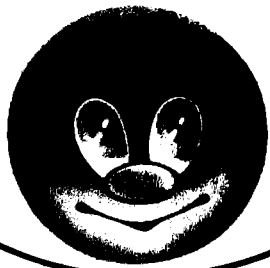

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে,তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

এই ঠিকানায় পাঠাওঃ "Fun with Gems" Dept. No. E22
Post Box No. 56, Thane 400 601. Maharashtra.

**রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্**

CHAITRA-C-263 BEN

বাংলা, হিন্দিতে 'কে? কে?' জিজ্ঞেস করলেন। কোনো উত্তর পেলেন না। দুমদুম আওয়াজটাও একটু পরে থেমে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ।

কাকাবাবু আর সন্তু দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ শব্দটা না হওয়ায় কাকাবাবু বললেন, "এবার দরজাটা খুলে দেখা যাক।"

সন্তু প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, "না। কাকাবাবু, ওরা সুযোগেরই অপেক্ষা করছে। আমরা দরজা খুললেই—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা মানে কারা? আমি তো ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোরা যদি ইয়েতি দেখেও থাকিস, কিন্তু ইয়েতি কখনো মানুষকে তাড়া করে এসেছে, এ-রকম তো শোনা যায়নি। যারা ইয়েতি দেখেছে বলে দাবি করে, তারা সবাই বলেছে, ইয়েতি হয় খুব ভিতু অথবা লাজুক প্রাণী। তারা মানুষ দেখলেই পালিয়ে যায়। তোদের দেখেও তো পালিয়েছে। তারা হঠাৎ গম্বুজের দরজায় এসে ধাক্কা দেবে কেন?"

একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে কাকাবাবু আবার বললেন, "তুই আমার পেছন দিকে সরে যা, সন্তু! ইয়েতি হোক বা যাই হোক, রিভলবারের গুলির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।"

কথা বলতে বলতেই কাকাবাবু বড় ছিটকিনিটা খুলে ফেললেন। তারপর এক হ্যাঁচকা টান দিলেন দরজায়।

দরজাটা খুলল না।

কাকাবাবু আরও জোরে টানলেন। এবারও খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, "কী হল? পুরনো আমলের দরজা, ওদিক থেকে ধাক্কা দেওয়ায় বোধহয় খুব এঁটে গেছে। তুই একটু হাত লাগা তো সন্তু।"

তখন কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনে মিলেই ঠেলল দরজাটা। কিন্তু তবু দরজাটা খোলার লক্ষণ নেই। সন্তু দুমদুম করে লাথি মারতে লাগল। তবু এক চুলও ফাঁক হল না।

একটু পরেই ওরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

## স্পষ্ট শুনেছি

"মিস্টার ওয়াটসন, কাম হিয়ার। আই ওয়ানট্ ইউ।"

আমেরিকার বস্টন শহরে একটা বোরডিং বাড়ির চিলেকোঠা থেকে এই বার্তাটি সেই বাড়িরই নীচের তলায় হল-ঘরে পৌঁছল।

তখন আনন্দে, উত্তেজনায় কথা বলাই তাঁর পক্ষে কষ্টকর। হাঁপাচ্ছেন, দম আটকে আসছে। কোনোরকমে তিনি বলতে পারলেন "মিস্টার বেল, আপনার প্রত্যেকটি কথা আমি শুনতে পেয়েছি, স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি!"

এই হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম টেলিফোনে কথা বলা। ১৮৭৬ সালে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এই সাতটি শব্দ বলে চালু করলেন সেই আশ্চর্য যন্ত্রটি যা নইলে আজ আমাদের জীবনযাত্রা অচল।

এবার কাকাবাবুর কপালেও ঘাম দেখা দিল।

দরজাটা এমনভাবে বাইরে থেকে বন্ধ করল কে? কীভাবেই বা বন্ধ করল? বাইরের দিকে দুটো মোটা কড়ায় তালা দেবার ব্যবস্থা আছে। কাকাবাবুরা এখানে আসবার আগে গম্বুজটার দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়াই ছিল। কাকাবাবু নেপাল সরকারের কাছ থেকে সেই তালার চাবি এনেছিলেন। কেউ যদি বাইরে থেকে অন্য কোনো তালা লাগায়ও, তাহলেও দরজাটা ঠেললে খানিকটা ফাঁক হতই। দু'পাল্লার দরজা, বাইরে থেকে কখনোই এমন শক্তভাবে বন্ধ হয় না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "তাহলে বুঝলি তো, এটা ইয়েতির কাজ নয়। মানুষের কাজ।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "আমরা ভাবছিলুম, দুমদুম শব্দ করে ওরা বুঝি আমাদের দরজা খুলতে বলছে। আসলে বোধহয় ব্যাপারটা উল্টো। ওরা দরজার বাইরে একটা লোহার পাটি কিংবা ঐ ধরনের কিছু লাগিয়ে দিয়ে গেছে। হাতুড়ি-টাতুড়ি পেটার জন্য ঐ রকম দুমদুম শব্দ হচ্ছিল।

সন্তুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, তাহলে তারা বেরুবে কী করে? কারা এমন করল মিংমার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, সে

কিছুতেই এ কাজ করতে পারে না। তাছাড়া তাকে আর কাকাবাবুকে মেরে ফেলে মিংমাদের লাভ কী?

সে মরিয়া হয়ে দরজাটার গায়ে খুব জোরে আর-একবার লাথি কষাল। দরজাটা একটুও নড়ল না।

কাকাবাবু বললেন, "ওতে কোনো ফল হবে না!"

তিনি খাটের কাছে ফিরে গিয়ে বসে পড়ে পাইপ ধরালেন। তারপর আবার হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "সন্তু, ছিটকিনিটা বন্ধ করে দে। ওরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করেছে। আমাদের দিক থেকেও বন্ধ রাখা দরকার। নইলে ওরা হঠাৎ ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।"

সন্তু ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল কাকাবাবুর কাছে। তার শরীরে যেন একটুও শক্তি নেই আজ। এই গম্বুজের মধ্যে তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে? এই ছোট্ট একটা আধো-অন্ধকার ঘর, খাবার-দাবারও বেশি নেই, এ-রকম ভাবে আর কতদিন বাঁচা যাবে? এর আগে সন্তু যে-কয়েকটি অভিযানে বেরিয়েছে কাকাবাবুর সঙ্গে, কোনোবার সে এত হতাশ হয়ে পড়েনি। এবারে সবচেয়ে যেটা অস্বস্তিকর লাগছে, সেটা হল এই যে, শত্রু যে কে, তা-ই এখনো জানা গেল না। এই বরফের রাজ্যে কে বা কারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসতে পারে, সে কথাটাই তার মাথায় ঢুকছে না।

সে ভেবেছিল, এবার সে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে এসেছে। পথে অনেক বিপদ থাকবে তো বটেই, কিন্তু কেউ যে শত্রুতা করবে, সে-কথা সে কল্পনাও করেনি আগে। কাকাবাবুর কথাই ঠিক, ইয়েতি কখনো এই-ভাবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না।

কাকাবাবু খানিকটা আপন মনেই বললেন, "বাইরে থেকে কেউ এসে খুলে না দিলে এ দরজা ভেঙে বেরুনো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সাহায্যের জন্য আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু ওদের এসে পৌঁছতে অন্তত দু-তিন দিন লেগে যাবে!"

সন্তু বলল, "দু-তিন দিন? তার মধ্যে তো আমরা এখানে দম বন্ধ হয়েই মরে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "ওপরের জানলা দিয়ে হাওয়া আসে...তা হলেও দু-তিন দিন এইটুকু ঘরের মধ্যে থাকা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া, ওরা যদি আবার এসে দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে..."

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওরা মানে কারা?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই তো কথা, ওরা মানে কারা, তা তো আমিও বুঝতে পারছি না। কারা রাত্তিরবেলা বরফের মধ্য দিয়ে আলো নিয়ে হাঁটে? অত বড় বড় পায়ের ছাপ কি সত্যিই ইয়েতির? খাটের তলা থেকে তুই ওয়্যারলেস সেটটা বার কর।"

দু'কানে হেডফোন লাগিয়ে কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ কর্-কর্ কর্-গরর্-গর্ আওয়াজ, তারপর কাকাবাবু হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, "হ্যালো হ্যালো, পীক্ নাম্বার হাণ্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন কলিং বেস, পীক নাম্বার হাণ্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন...এস ও এস ফ্রম রায়চৌধুরী, হ্যালো, রজার, ক্যান ইয়ু গেট মী...এস ও এস ফ্রম রায়চৌধুরী,... ইয়োর কোড স্লীজ...ওভার!"

তারপর কাকাবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে ওদিককার কথা শুনে নিজে আবার বলতে লাগলেন, কী-রকম যেন অদ্ভুত ইংরেজিতে, তার মধ্যে অঙ্কের সংখ্যাই বেশি। সন্তু কিছুই মানে বুঝতে পারল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

কাকাবাবু বেশ খানিকটা সময় ধরে কথা বললেন ওয়্যারলেসে। তাঁকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। এক সময় তিনি বেশ রাগের সঙ্গে বললেন, "ওভার অ্যান্ড আউট!" তারপর খুলে ফেললেন হেডফোন। পাইপটা ধরাতে গিয়ে লাইটার খুঁজে পেলেন না। অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "দূর ছাই, সেটা আবার রাখলুম কোথায়?"

কাকাবাবুর ওভারকোটে অন্তত দশ-এগারোটা পকেট। কখন কোন্ পকেটে তিনি কোন্ জিনিসটা রাখেন, তা নিজেই ভুলে যান। কয়েকটা পকেট হাতড়ে তিনি লাইটারটা পেয়ে গিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর কয়েকটা টান দেবার পর বললেন, "ওরা বেরিয়ে পড়েছিল... কিন্তু অত দেরি করে এলে তো চলবে না... একমাত্র উপায় যদি হেলিকপটারে আসতে

পারে...কিন্তু হেলিকপটার ওদের ওখানে নেই, আছে একটা নামচেবাজারে...সেখানে খবর দিয়ে যদি আনাতে পারে।"

আবার হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কাকাবাবু পাইপ টানতে লাগলেন। তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকেই আছে।

কাকাবাবু কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই ভয় পান না। তিনি বারবার বলেন, গায়ের জোর থাক বা না থাক, মনের জোর থাকলে মানুষ সবকিছু জয় করতে পারে। সন্তুর মনে পড়ল, কনিষ্কর মুণ্ডু খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল যে-বার, সেবার একটা ভয়ংকর গুহার মধ্যে পড়ে গিয়েও কাকাবাবু একটুও ঘাবড়াননি। আন্দামানে গিয়ে তিনি নিজে জোর করে জারোয়াদের দ্বীপে নেমেছিলেন। কোনোবার কাকাবাবুকে সে বিচলিত হতে দেখেনি।

গম্বুজের এই বিশাল লোহার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, এটা তো আর মনের জোর দিয়ে খোলা যাবে না। বাইরের সাহায্য দরকার। সে সাহায্য কখন আসবে কে জানে!

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা কী হচ্ছে! কারা দরজা বন্ধ করল? তুই আবার ইয়েতি দেখলি! সত্যি করে বল্ তো, ঠিক দেখেছিলি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ কাকাবাবু!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি দেখতে পেলাম না কেন? আমার দেখাই বেশি দরকার ছিল!"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "ছটা বাজে। বাইরে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে গেছে। আজ সারা রাত জেগে থাকতে হবে। তুই বরং এক কাজ কর সন্তু, তুই দূরবিনটা নিয়ে ওপরে জানলার কাছে বসে থাক। দ্যাখ, কোনো আলো-টালো চোখে পড়ে কি না। হেলিকপটারটা যদি আসে, সেটারও আলো দেখতে পাবি।"

সন্তু দূরবিন নিয়ে উঠে গেল ওপরে। সেখানেই বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝখানে একবার নীচে নেমে কিছু বিস্কুট আর চীজ খেয়ে নিল। কাকাবাবু স্পিরিট ল্যাম্প জেলে জল গরম করে দু'কাপ কফি বানালেন। তারপর তিনি খাটের ওপর বসে

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস-LR.28-203 BG
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

উরুর ওপর রিভলবারটা রেখে একটা বই পড়তে লাগলেন।

সন্তু দুরবিন নিয়ে গম্বুজের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। কিছুই দেখা যায় না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আকাশও দেখা যায় না, এ-রকম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে চোখ ব্যথা করে।

সেখানেই সন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না। হঠাৎ এক সময় সে রীতিমতন ব্যথা পেয়ে জেগে উঠল। তার মুখে যেন ফুটেছে হাজার হাজার সুচ। সারা শরীরটা কেঁপে উঠল ঠকঠক করে।

চমকে উঠতেই তার হাত থেকে দুরবিনটা খসে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে লাগল শব্দ করে।

নীচ থেকে কাকাবাবু বলে উঠলেন, "কী হল, সন্তু?"

সন্তু তখন জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করার জন্য ব্যস্ত। কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না, এত জোর হাওয়া। বাইরে দারুণ তুষারঝড় উঠেছে। গম্বুজের ভেতরটা কুচো কুচো বরফ আর হিমশীতল বাতাসে ভরে যাচ্ছে। আর বেশি হাওয়া ঢুকলে তাদের ঠাণ্ডায় জমে যেতে হবে।

অতি কষ্টে জানলা বন্ধ করে নীচে নেমে এল সন্তু। এমন ঠাণ্ডা লেগেছে যে তার চোয়াল দুটো যেন আটকে গেছে। অতি কষ্টে সে বলল, "কাকাবাবু, বাইরে...তু-ষা-র-ঝড়! দারুণ জো-রে!"

কাকাবাবু বললেন, "তুই আমার কাছে চলে আয় শিগগিরই!"

সন্তু কাকবাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সন্তুর মুখখানা ধরে খুব জোরে দু'হাত ঘষতে লাগলেন তার গালে। একটুক্ষণ এ-রকম থাকার পর সন্তুর গাল দুটো অনেকটা গরম হয়ে গেল, চোয়ালটাও স্বাভাবিক মনে হল।

কাকাবাবু বললেন, "শিগগির স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়।"

তারপর যেন নিজের ওপরই রাগ করে বললেন, "গোদের ওপর বিষফোড়া! একেই এই কাণ্ড তার ওপর আবার তুষারঝড়। এই ঝড় কখন থামবে কে জানে! ঝড় না থামলে তো হেলিকপটার এদিকে এলেও নামতে পারবে না!"

(ক্রমশ)

## ছবির মজা

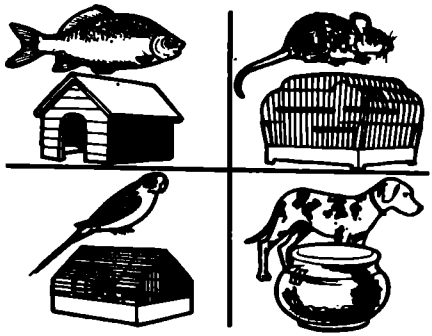

চারটি প্রাণী উল্টোপাল্টা জায়গায় চলে এসেছে। কাকে কোথায় ঢোকানো দরকার, তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো। উত্তর ঠিক হলে তাকে একটা লজেন্স দাও।

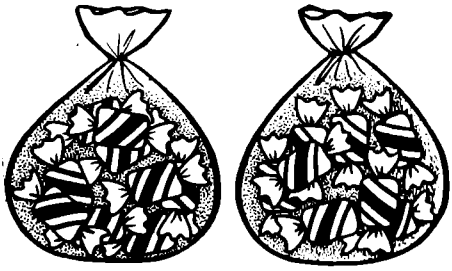

দুই থলিতেই কিছু-কিছু টফি আছে। কোন্ থলিতে বেশি টফি আছে, তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো। উত্তর ঠিক হলে তাকে একটা টফি দাও।

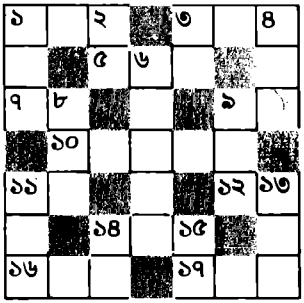

**সংকেত : পাশাপাশি :** (১) গমের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। (৩) অরণ্য। (৫) অতীতের তুর্কি-মঙ্গোল জাতি। (৭) স্বর্গ যখন শরীরের ইন্দ্রিয়। (৯) পাতা। (১০) সাঁওতাল পরগনার মহকুমা, আবার পাহাড়ও। (১১) কুকুরের পেটে নাকি সয় না। (১২) বিভাজ্য অঙ্ক। (১৪) পশু-পাল। (১৬) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরি-ধেয়। (১৭) কঠিন পদার্থ গলাবার ক্ষমতা আছে যার।

**উপর-নীচ :** (১) পাখির নামে তদন্ত। (২) কর্ণ যা ছিলেন। (৩) ব্যাসার্ধ। (৪) এক উচিতবক্তা কৌরব। (৬) সপ্তমাশ্চর্যের একটি। (৮) দাঁতে কাঠ কাটে। (৯) পাঁক। (১১) এক অপ্সরা। (১৩) যা থেকে আদি কবি। (১৪) বাণ। (১৫) সুভদ্রার আর-এক নাম।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ছোটকাকে বলাই ছিল, সামনে পরীক্ষা, তাই এমন ধাঁধা দেবে, যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। একেবারে চটপট চটপট উত্তর দেব।

ছোটকা বলেছিল, কোনো চিন্তা নেই সতুবাবু। এমন ধাঁধা দেব এবার যে কোনো চিন্তাই থাকবে না।

বিজয়ার প্রণামের পালা সেরে চলে আসছি, ছোটকা আমাকে বলল, "একটু বসে যাও সতুবাবু। ধাঁধা দিয়েই মিষ্টিমুখ করা যাক।"

ধাঁধার উত্তর জানা থাকলে, ধাঁধা শুনতে ভালই লাগে, কিন্তু না পারলে? আমি তাই বললাম,

"মনে আছে তো, খুব সোজা ধাঁধা দেবে এবার।"

ছোটকা বলল, "খুব সহজ ধাঁধা। বাসে একটা ছোট্ট ছেলের মুখ থেকে শোনা। ছেলেটা তার বন্ধুকে বলছিল। আমি পেছনের সীটে বসে শুনছিলাম। বেশ ভাল লাগল। আর তক্ষুনি ঠিক করলাম, এই ধাঁধাটাই সতুবাবুকে দেব এবার।"

ছোটকা বলে গেল, আমি লিখে নিলাম।

**প্রথম ধাঁধা :** একটি ছেলে তার বন্ধুকে বলছে, "কাবলু আমার ছোট ভাই। চার বছর আগে আমার বয়স ছিল কাবলুর বয়সের দ্বিগুণ।

আর আজ? হায়, আমিও বড় হলাম, কাবলুও বড় হল কিন্তু আজ আমার বয়স তার বয়সের দ্বিগুণ আর নেই। এখন আমার বয়স কাবলুর বয়সের দেড় গুণ। কী কাণ্ড!"

ছেলেটির বয়স কত, কাবলুর বয়সই বা কত?

**দ্বিতীয় ধাঁধা :** নৃপতিকে ভূপতি বলল, "পশুপতির সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক, আমার সঙ্গে তোমার ছেলের সেই একই সম্পর্ক।"

"ঠিকই।" নৃপতি জবাবে বলল, "কেননা, পশুপতি তোমার যা হয়, তুমিও আমার ঠিক তাই হও।"

ভূপতি, নৃপতি আর পশু-পতির পারস্পরিক সম্পর্কটা কী?

**তৃতীয় ধাঁধা :** ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ এবং ০—এই দশটা সংখ্যাকে যেমন খুশি সাজিয়ে, যেমন খুশি চিহ্ন ব্যবহার করে এমন অঙ্ক লিখতে পারো, যার উত্তর হবে ১? প্রতিটি সংখ্যা একবারই মাত্র ব্যবহার করবে কিন্তু। অনেক উত্তর হয়, একটা বললেই চলবে।

**চতুর্থ ধাঁধা :** বেমানান সংখ্যা-টিকে খুঁজে বার করো—
১৭, ৫১, ৮৫, ১১৯, ১৫৩, ১৭০, ১৮৭

**গতবারের উত্তর :** (১) আশি হাজার টাকায় যদি ১/৩ অংশ কেনা যায়, তাহলে ব্যবসার মূল্য ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এর মধ্যে কিরণলালের অংশ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার, লক্ষপতির অংশ ৯০ হাজার টাকার। তাহলে, নতুন শর্তে, প্রত্যেকে ১/৩ অংশের মালিক হিসেবে ৮০ হাজার টাকা করে রাখবে, বাকিটা ফেরত নেবে। লক্ষপতি সেক্ষেত্রে পাবে ১০ হাজার টাকা, কিরণলাল পাবে ৭০ হাজার। (২) ৫০ বছর। (৩) ২২২ (৪) ১১১ (বন্ধনীর দু পাশের সংখ্যা বিয়োগ হচ্ছে)

সত্যসন্ধ

## কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার ছিল
হাতঘড়ির চাবির ছবি
ফোটো তপন দাশ

## উত্তর বটে

প্রঃ একটা চাকরির ইন্টারভিউ নেবার ভার পড়েছে আমার উপর। ছেলেটিকে আমেরিকার প্রথম আর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টের নাম জিজ্ঞেস করলাম পর পর, দুটোই ঠিক ঠিক বলে দিল। আমি কি প্রশ্ন চালিয়ে যাব না ছেলেটিকে চাকরিতে দিয়ে নেব?

উঃ চট করে চাকরিতে নিয়ে নেব, কারণ আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্টের নাম আমি নিজেই জানি না।

প্রঃ বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীটা নাকি ক্রমেই ঠান্ডা হয়ে মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে আসছে। সত্যিই যদি ঠান্ডা হয়ে যায়, তা হলে কী উপায় হবে?

উঃ কেন, সবাই মিলে সাহারায় গিয়ে থাকব।

সুসেন

## মজার খেলা

এবারে যে খেলাটি শিখব আমরা এটাও দারুণ মজাদার। আর, খেলা যায় অনেকে মিলে একসঙ্গে।

খেলাটা হল প্রশ্ন আর উত্তরের। একজন প্রশ্ন করবে, অন্যরা একে-একে তার প্রশ্নের উত্তর দেবে।

খেলার মজাটা প্রশ্নে নয়, উত্তরে। কেননা, উত্তর যে দেবে, তাকে একটা শর্ত মেনে চলতে হবে। শর্তটা হল, আগে থেকে একটা অক্ষর সবাই মিলে ঠিক করে নেবে, যে-অক্ষরটা উত্তরে কিছুতেই রাখা চলবে না।

যেমন ধরো, খেলার আরম্ভে সবাই মিলে ঠিক করে নিলে যে, 'ল' অক্ষরটা হবে নিষিদ্ধ অক্ষর। প্রশ্নকর্তা ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু উত্তরদাতা তার উত্তরে 'ল' অক্ষরটা ব্যবহার করতে পারবে না।

ধরো, তুমিই প্রশ্নকর্তা। তুমি

হয়তো এক প্যাকেট তাস দেখিয়ে একজনকে প্রশ্ন করলে, তাস খেলতে কেমন লাগে?

সে যদি অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলে, ভাল লাগে, তাহলে দু-বার 'ল' অক্ষরটা ব্যবহার করা হল। সে আউট। আবার, 'খারাপ লাগে' বললেও আউট, কেননা 'ল' আছে একবার। আসলে যেমনই লাগুক, তাকে বলতে হবে, মোটামুটি, মন্দ নয় অথবা খারাপ—এইরকম, যাতে 'ল' অক্ষর না থাকে।

একজনকে একটাই প্রশ্ন করা হবে। এইভাবে পর-পর সকলকে। একটা অক্ষর নিয়ে এক দান খেলা শেষ হলে নতুন অক্ষর বাছবে। এইভাবে অফুরন্ত সময় কেটে যাবে।

মজারু

## হাসিখুশি

"এই ক্লাসে-যারা আহাম্মক আছ উঠে দাঁড়াও," শিক্ষকের এই নির্দেশের পর সমস্ত ক্লাস কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর কী ভেবে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়াল।

শিক্ষক তাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, "তুমিই তাহলে এ ক্লাসের একমাত্র আহাম্মক?" ছেলেটি বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে সে কথা অস্বীকার করায় শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তাহলে দাঁড়ালে কেন?" ছেলেটি ততোধিক বিনীতভাবে বলল, "স্যার, আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন, কেমন খারাপ দেখাচ্ছে, তাই দাঁড়ালাম।"

"এই যে মীতবাবু, বহুদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল। আগে কত রোগা ছিলেন, মোটা হয়ে গেছেন, রঙ কালো ছিল ফর্সা হয়ে গেছেন, মাথার টাকটাও দেখছি নেই। আপনি দেখছি একেবারে বদলে গেছেন।" এই বলে রাস্তায় হঠাৎ দেখা অপরিচিত এক ভদ্রলোক রমেশবাবুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

রমেশবাবু, বিরক্ত হয়ে ভদ্র লোকটির হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, "দেখুন, আমার নাম মীতবাবু নয়।"

অপরিচিত ভদ্রলোক অবাক হয়ে রমেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কী মীতবাবু, নামটাও বদলে ফেলেছেন!"

ছবি অহিভূষণ মালিক

# ছোটদের যত সেরা বই

**বিমল কর** কয়েকখানি আশ্চর্য বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। তার মধ্যে 'ওআণ্ডার মামা' হল তুমুল হাসির। জাপান-ফেরৎ এক আজব মামার বিচিত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মজাদার বর্ণনা। 'কাপালিকরা এখনও আছে' অথবা 'রাজবাড়ির ছোরা'য় গা-ছমছম অ্যাডভেনচার ও রহস্য-কাহিনী। এ-যুগের এক কাপালিকের যাবতীয় চালাকি কীভাবে ধরে ফেললো কিকিরা নামে এক ম্যাজিসিয়ান আর সেই কিকিরাই রাজ-বাড়ি থেকে হারানো এক মন্ত্রপূত ছোরার রহস্য কীভাবে ভেদ করলেন, তাই নিয়ে এই দুটি বই। আরেকটি বই 'হারানো জীপের রহস্য'—'রাজবাড়ির ছোরা'র সঙ্গে এক মলাটে বেরিয়েছে—এক দারুণ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী।

**গিরিধারী কুণ্ডু** দুটি চমৎকার বই লিখেছেন তোমাদের জন্য। একটির নাম 'টংসা চু'। ভূটানের নদী টুংসা, আদর করে সবাই ডাকে টংসা। সেই নদীকে ঘিরে ছবির মতো দেশ ভূটানকে নিয়ে দারুণ-দারুণ সব গল্প এই বইতে। এই বইটি একটি পুরস্কারও পেয়েছে। আর একটি বইয়ের নাম 'রাত একটা।' এটি অবশ্য একেবারে অন্য স্বাদের, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী। এটির ঘটনা শুরু ট্রেন থেকেই, শেষ হয়েছে দার্জিলিঙে এসে। এক নিখোঁজ শিকারীর খোঁজ করতে গিয়ে কী ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের জাল আবিষ্কৃত হল, তাই নিয়েই লেখা এই বইটি।

**সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **গিরিধারী** কুণ্ডুর টংসা চু ৫ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ সুকুমার রায়ের সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ংকর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৫ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **শঙ্করীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলে-দের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** পাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

# খেলতে খেলতে

সুনী গোস্বামী

॥ ৩১ ॥

বাঙ্গালোরে সিংহলের সঙ্গে প্রি-অলিম্পিকের ফিরতি ম্যাচ আমি খেলতে পারিনি, কলম্বো হাসপাতালে আমার ওই অপারেশনের জন্য। আমার বদলে দলের অধিনায়কত্ব করেছিল জারনেল সিং। ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে সিংহল হেরেছিল ৭—০ গোলে। তিনটি গোল করেছিল আপ্পালারাজু, দুটি সারমাদ খাঁ এবং একটি করে ইন্দার সিং ও সুকুমার সমাজপতি।

এবার আমাদের সামনে কঠিন সংগ্রাম। ইজরায়েলে যাব এশিয়ান কাপে খেলতে। সেখান থেকেই যাব তেহরানে ইরানের সঙ্গে প্রি-অলিম্পিক ম্যাচের জন্য। আমি তখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠিনি। দলের কোচ হিসাবে পেন্টিয়ার যোগ্যতা নিয়েও কথা উঠেছে। কিছুদিন আগে পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ড থেকে এক কোচ আমদানি করেছিল। নাম রাইট। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সফরে ওই রাইটকে দলের কোচ করার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে ফুটবল ফেডারেশনের উপর প্রচ্ছন্ন চাপ এল। কারণ পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট চলে সরকারের খরচে। সরকার চান খেলাধুলায় দেশের সম্মান বাড়ুক, দেশ এগিয়ে যাক। সুতরাং সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পেন্টিয়ার বদলে রাইটকে দলের কোচ করা হল।

পেন্টিয়া মোটামুটি ভাল কোচ ছিলেন। তাঁর আন্তরিকতাতেও ঘাটতি ছিল না। দোষের মধ্যে ছিলেন একটু তোতলা। কথা বলার সময় তোতলামি করতেন। কিন্তু রাইট কি খুব গুণী কোচ ছিলেন?

দ্যাখো কীভাবে মানুষ ভুল করে। তোমরা নিশ্চয়ই বিলি রাইটের নাম শুনেছ। মস্ত বড় ফুটবলার। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন। আমাদের ধারণা ছিল ফুটবল খেলা থেকে অবসর নেবার পর সেই বিলি রাইটকেই পাতিয়ালায় আনা হয়েছে। কিন্তু পরে জানলুম, সেই বিলি রাইট নন, এর নাম হ্যারি রাইট। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দুই-একটি ম্যাচে ইংল্যান্ডের গোলে খেলেছেন। পরে শুনলুম পাতিয়ালার এন আই এস-এর কর্তারাও একই ভুল করেছেন। তাঁরা আনতে চেয়েছিলেন বিলি রাইটকে। ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো হল হ্যারি রাইটকে। কীভাবে ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল তার হদিস মেলেনি।

বিখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক বেরী সর্বাধিকারী তখন তীব্র ভাষায় পাতিয়ালার কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন, "বিলেতি

এশিয়ান কাপ : রৌপ্য-পদক

জিনিসের উপর আমাদের দারুণ মোহ। 'মেড ইন ইংল্যান্ড' হলে আমরা যেন হাতে স্বর্গ পাই। ধরে নিই ওর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।"

রাইট কি রং—সেটা বিচার না করে কোচিংয়ের জন্য এই দুই নম্বর রাইটকে বিলেত থেকে আনা এবং তাঁর উপর আমাদের ছেড়ে দেবার ফল শুভ হয়নি।

কোচ তো আর খেলেন না। স্বীকার করছি, আমরা প্রি-অলিম্পিকে ইরানের সঙ্গে ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, কোচিংয়ের গুণ, তাঁর পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিত্বের উপর দলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি, হ্যারি

রাইটকে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত সত্যিই রং হয়েছিল। তিনি আমাদের নতুন কিছুই দিতে পারেননি। তাছাড়া 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' ব্রিটিশ সরকারের এই বিভেদ-নীতি প্রয়োগ করতেও চেষ্টা করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা, ফুটবল সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা যদি ভাল থাকত এবং থাকত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি, তাহলে প্রি-অলিম্পিকের গুরুত্বপূর্ণ খেলার মাত্র ক'দিন আগে এশিয়ান কাপে ভারতের খেলার প্রশ্নে আপত্তি তুলতেন।

যাই হোক, অসুস্থ থাকায় ফুটবলের সঙ্গে অনেকদিন আমার সম্পর্ক ছিল না। মাত্র সপ্তাহখানেক অনুশীলনের পর এপ্রিলের শেষে দলবল সহ যাত্রা করলুম ইজরায়েলে। সেখানে গিয়ে উঠলুম রাজধানী তেল আবিবে গ্র্যান্ড অ্যাকাডিয়া হোটেলে। সী-বীচের লাগোয়া চমৎকার হোটেল।

আমাদের আগে ভারতের কোনো দল ইজরায়েলে খেলেনি। পরেও বোধহয় না। চমৎকার একটি দেশ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেলামেশা করে বুঝেছিলুম, ইজরায়েলের মানুষের বুদ্ধি প্রখর এবং সেখানকার প্রতিটি মানুষ কষ্টসহিষ্ণু। দেশটি পশ্চিম দুনিয়ার যে-কোনো উন্নত দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

প্রথম এশিয়ান কাপের খেলা হয়েছিল ভারতের এর্নাকুলামে ছাপ্পান্ন সালে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। চার বছর পরে ষাট সালে দ্বিতীয় এশিয়ান কাপও অধিকারে রাখে ওই দক্ষিণ কোরিয়া। তৃতীয় প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী সেই দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমাদের প্রথম খেলা। আগেরদিন তেল আবিব থেকে আমরা যাত্রা করলুম বন্দর-শহর হাইফায়। সেখানেই খেলা হবে সাতাশ মে তারিখে। সকালেই দারুণ এক দুঃসংবাদে গোটা দলটি বিষাদে ডুবে গেল। ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর ইহজগতে নেই। বলো, ওই সংবাদ পাবার পর ওইদিন কি ফুটবল খেলা উচিত? কারো মন চায় খেলতে? আমরা খেলা স্থগিত রাখার

তেল-আবিবের সমুদ্রতীরে চুনী ও জারনেল মক-ফাইটে মত্ত। পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন কোচ হ্যারি রাইট।

পীতজ্বর-সংক্রান্ত সার্টিফিকেট না-থাকায় ভারতীয় ফুটবল দলকে তেল আবিব এয়ারপোর্টে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

আবেদন করলুম। কর্তৃপক্ষ নারাজ। বললেন, খেলা স্থগিত রাখলে সময়সীমার মধ্যে তাঁরা প্রতিযোগিতা শেষ করতে পারবেন না, ভারত দলও প্রি-অলিম্পিক ম্যাচ খেলার জন্য সময়-মতো তেহরানে পৌঁছতে পারবে না। আমাদের দলের ম্যানেজার উইং কম্যাণ্ডার কে কে গাঙ্গুলি এবং আমি কিছুতেই ওইদিন খেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কোচ হ্যারি রাইট কিন্তু চাপ দিচ্ছেন। তাঁর যুক্তি : এশিয়ান কাপের পর প্রি-অলিম্পিক ম্যাচের জন্য তো দুই-একদিন বিশ্রাম দরকার। তাছাড়া 'প্রাইম মিনিস্টারস উইল কাম অ্যাণ্ড প্রাইম মিনিস্টারস উইল গো'। তার জন্য বিদেশে খেলা বন্ধ রাখব কেন?

হায়, নেহরু যে আমাদের কত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদে আমরা কী গভীর বেদনা অনুভব করছিলুম বিদেশী কোচ তা বুঝবেন কীভাবে? মুখ্যত প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের এবং হ্যারি রাইটের চাপেই আমাদের সেইদিন দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলতে হয়েছিল। মাঠে নেমেছিলুম জার্সির হাতায় চওড়া কালো ফিতে বেঁধে।

ফুটবলে এশিয়ার শক্তিশালী দেশগুলিকে নিয়েই এশিয়ান কাপের আসর বসে চার বছর অন্তর। সেবার (১৯৬৪ সাল) তৃতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল মাত্র চারটি দেশ। ইজরায়েল, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকং। শুনলুম প্রি-অলিম্পিকের আগে প্রতিযোগিতা হচ্ছে বলেই ইরান যোগ দেয়নি। ইরানের কোচ কিন্তু মুভি ক্যামেরা সহ ইজরায়েলে হাজির হয়েছিলেন আমাদের খেলার টেকনিক ট্যাকটিকস ফিলমে তুলে নিতে। নিয়েছিলেনও।

দুবারের এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় আমাদের ২—০ গোলে জয়কে শোকের দিনে সামান্য সান্ত্বনা ছাড়া আর কী বলব? উনত্রিশ মে তারিখে ইজরায়েলের কাছে আমরা হেরেছিলুম ০—২ গোলে। দোসরা জুনে শেষ ম্যাচে হংকংকে ৩—১ গোলে হারিয়ে রানার্সের পুরস্কার নিয়েছিলুম ইজরায়েলের তখনকার কালচারাল মিনিস্টার গোল্ডা মেয়ারের হাত থেকে। এই অসাধারণ নারী গোল্ডা মেয়ার পরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হন।

এশিয়ান কাপের খেলা হয়েছিল লীগ নিয়মে। সব খেলায় জিতে ছয় পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইজরায়েল। দুটি খেলা জিতে চার পয়েন্টে আমরা হয়েছিলুম রানার্স। দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছিল দু পয়েন্ট হংকংয়ের বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে। হংকং কোনো পয়েন্ট পায়নি।

ইজরায়েল চমৎকার খেলেছিল। ইউরোপের এক নামী কোচ আধুনিক ফুটবলের ছক ও ধারা ইউরোপ থেকে তুলে এনে বোধহয় উপহার দিয়েছিলেন ইজরায়েলকে। ট্যালেন্ট এবং ট্রেনিংয়ের সমাহারে ইজরায়েল শক্তিশালী ব্যালান্সড সাইডে পরিণত হয়েছিল। আমাদের ভারত দলের অনেকেই তখন পরিশীলিত ফুটবলার নয়। চার-পাঁচজন টপ ক্লাস খেলোয়াড় আর পাঁচ-ছয়জন কম অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নিয়ে দল গড়া হলে সে-দলের পক্ষে ইজরায়েলের মতো শক্তিশালী ও সংগ্রামী দলের মোকাবিলা করা শক্ত। আমরা ঠিকভাবে খেলতেও পারিনি ইজরায়েলের সঙ্গে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে দুটি গোল করেছিল কাজল মুখার্জি ও আপ্পলারাজু। হংকংয়ের বিরুদ্ধে তিনটি

দুষ্টুমী করার এইতো বয়স
অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন, হাজার দুরন্তপনা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অটুট থাকবে
বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমী করবে— এটাই তো স্বাভাবিক। রোদে খেলবে, বৃষ্টিতে ভিজবে, খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে— এটাই তো নিয়ম। এতে ভাবনার কিছু নেই। সারা বছর নিয়ম করে অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন। এই তেলের 'এ' ও 'ডি' উপাদান শরীরকে দুরন্তপনার সব চোট থেকে বাঁচাবে। ত্বক খসখসে হতে দেবে না, হাড় মজবুত করবে।
ADVITAMIN
FOR GROWTH AND VIGOUR OF THE BABIES
AD
VITAMIN MASSAGE OIL FORTE
CONTAINS VITAMIN A & D AND OLIVE OIL
SUNNY
সানি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

গোলের একটি করেছিলুম আমি, বাকি দুটি সুকুমার সমাজপতি ও ইন্দার সিং। হ্যাঁ, সেই ইন্দার সিং যে এখনও ফুটবল খেলছে, তরুণদের উপর টেক্কা দিচ্ছে। তখন ইন্দার সিং সবে উঠছে।

কাজল এবং আপ্পালারাজু সম্পর্কে দুটি-একটি কথা বলতে চাই। আগেই তো লিখেছি প্রি-অলিম্পিকে সিংহলের বিরুদ্ধে প্রথম ও ফিরতি ম্যাচে আপ্পালারাজু তিনটি করে গোল পেয়েছিল। কলকাতার মাঠে আমরা অনেক ভাল সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও স্ট্রাইকার দেখেছি। তাদের সঙ্গে আপ্পালার তুলনা করব না। কিন্তু গোল করায় আপ্পালার ছিল বৈশিষ্ট্য। অ্যাণ্টি-সিপেশন ছিল খুবই ভাল। ডান পায়ে ছিল জোরালো রেডি শট। খেলত বি এন আর দলে। আপ্পালার যখন ফর্ম ছিল, তখন বি এন আর-এর সঙ্গে খেলায় মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং— তিন প্রধানই আপ্পালাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। চিন্তা থাকত কখন গোল করে বসে। হাফ চান্সকে ফুল চান্সে পরিণত করার ক্ষমতা ছিল।

আর কাজল? আমার ভীষণ প্রিয় খেলোয়াড় ছিল। সাহস শৌর্য শক্তি স্বাস্থ্য— সবই ছিল। তার উপর ছিল অসম্ভব বল কণ্ট্রোল। ফুটবলের পরিভাষায় যাদের বল-প্লেয়ার বলা হয় কাজল ছিল তাদেরই এক-জন। বাড়তি গুণ ছিল নানা পজিশনে খেলতে পারত। লেফট-হাফ, লেফট-ইন, লেফট-আউট যেখানে খেলাও, সুন্দর মানিয়ে নিতে পারত। খুঁত ছিল বল ধরা-ছাড়ায়। কখন বলটি ছাড়তে হবে এবং কতক্ষণ পায়ে রাখতে হবে —এ ব্যাপারে যদি ধারণাটা স্বচ্ছ থাকত তবে অনেক বড় ফুটবলার হতে পারত। অন্তত যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বড়। তার সংগ্রামী শক্তি, বল কণ্ট্রোল এবং নানা পজিশনে খেলার গুণের জন্য যে-কোন অধিনায়কই তাকে দলে চাইতেন। আমিও সবসময় চেয়েছি কাজলকে দলে রাখতে।

ইজরায়েলে এক সপ্তাহে তিনটি শক্ত ম্যাচ খেলে আমরা একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। কয়েকজন খেলোয়াড়ের অল্প-স্বল্প চোট-আঘাতও লেগেছিল। এবার যাব তেহরানে সাতই জুন তারিখে ইরানের সঙ্গে প্রি-অলিম্পিক ম্যাচ খেলতে। (ক্রমশ)

## মণিমেলার খবর

**কেন্দ্রীয় সমাচার**

পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টি-টিউশনে সম্প্রতি মণিমেলা মহাকেন্দ্রের পরি-চালনায় বার্ষিক শিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা ব্যায়াম, বিভিন্ন খেলাধুলা, ব্রতচারী সংগঠন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষকদের নিকট হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে।

বিভিন্ন দিনে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান কেন্দ্র, উদ্যান, জেল ইত্যাদি পরিদর্শন করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের কর্মসূচী অনু-সারে মহাকেন্দ্রে ছোটদের পাঠাগার পরিচালনা ও প্রথামুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পাঠাগারিকগণ শিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

**আঞ্চলিক সংবাদ**

শ্রীরামপুর অঞ্চলের মণিমেলাগুলির কুচ-কাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শান্তিকামী মণিমেলা ও সোনার বাংলা মণিমেলা। শ্রেষ্ঠ আদেশ-দানকারী হিসাবে নির্বাচিত হয় সোনার বাংলা মণিমেলার সোমা ভট্টাচার্য।

**মণি-সন্দেশ**

জামসেদপুরের নিউ তরুণ মণিমেলা শারদোৎসবে নাচ, গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ইণ্টালি মণি-মেলায় বিজয়া সম্মিলনীতে আবৃত্তি, গান ও নাটকের আয়োজন ছিল। অশোক মণিমেলা গোবরডাঙ্গা শিশু-উৎসবে ব্রতচারী নৃত্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে। জাগ্রত মণিমেলা গান্ধীজির জন্মদিনে শিশু-উৎসব পালন করে।

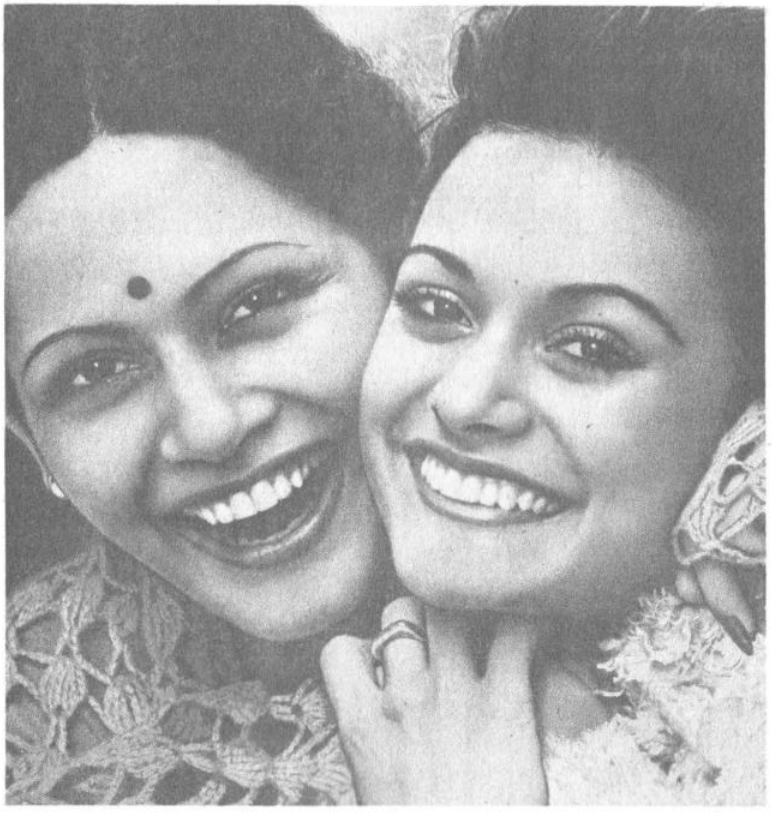

# শীতে শুষ্ক ত্বক কোথা? সে আজ হাসির কথা... পন্ডস্ কোল্ড ক্রীম মেখে

শীতের নির্দয় ব্যবহারে আপনার তরুণ ত্বক ফেটে, শুকিয়ে, বলিরেখায় ভরে যায়। ঠিক এই সময়েই আপনার ত্বকের চাই, সৌন্দর্য্য-তেলে ভরপুর পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম! মুখ, গলা,

হাত, কনুই আর পা...যেখানেই শীতের জন্যে পণ্ডসের সুরক্ষার প্রয়োজন হবে, একটুখানি ক্রীম মেখে নেবেন···দেখবেন, আপনার ত্বক হবে আপনার মতই নিশ্চিন্ত, প্রাণবন্ত!

## শীতে আপনার ত্বকের জন্যে প্রয়োজনীয় সৌন্দর্য্য-তেলে ভরপুর পন্ডস্

লিনটাস-PIL.CC.I-1810 BG

# নিকটমতীর ফল

অনিরুদ্ধ কর

এক কাঠঠোকরা পাখি. তার মনে হাজার শখ আর খেয়াল। তার অনেক শখ আর খেয়ালের মধ্যে একটি ছিল ভাল কোনো মানুষের সঙ্গে মিতালি পাতানো।

কিন্তু একে মানুষগুলো ডানার বদলে দুটো হাত ঝুলিয়ে রেখেছে কাঁধের দু-পাশে আর রাখেনি মুখে ছুঁচলো ঠোঁট বা চমৎকার পালকওয়ালা লেজ তার ওপর এক-মাথা চুলের তলায় পুষে রেখেছে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব ফন্দি. তাই কাঠঠোকরা বেচারা কিছুতেই তার শখ মেটাতে পারছিল না।

একদিন যখন সবে একটা জামগাছে ঠোকরানো শেষ করে সে উড়ে গিয়ে বসেছে বনের সবচেয়ে পুরনো বুড়ো শাল গাছটার গায়ে, তখন সে শুনতে পেল তারই মতন অথচ তার চেয়ে ঢের জোরে কে যেন কাঠের গায়ে শব্দ করছে। একটু ওড়াউড়ি করে খুঁজতেই সে দেখতে পেল একজন মানুষকে। সে কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছিল। কাঠ কাটার খট-খটাশ. খট-খটাশ শব্দটা নির্জন বনের বিশাল বিশাল গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে আরো জোরালো হয়ে ফিরে ফিরে আসছিল।

কাঠঠোকরা শুনেছিল এই ধরনের মানুষকে বলে কাঠুরে। বনে বনে ঘুরে এরা কাঠ কেটে নিয়ে যায়। কাঠঠোকরার হঠাৎ মনে হল যে যদি কোনো মানুষের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করেই. তবে সে-মানুষ হবে কাঠুরে। কারণ কাঠুরে আর কাঠঠোকরা পাখি—দু-জনের কাজই এক ধরনের। দু-জনেই কাঠের গায়ে ঠোকরায় ; একজন ঠোঁট দিয়ে আর একজন কুড়ুল দিয়ে। তাই সে ঠিক করল এই কাঠুরের সঙ্গেই সে ভাব করবে।

একটু পরেই কাঠঠোকরা বুঝতে পারল যে, দুজনের কাজ একরকম হলে কী হবে, তাদের কথা মোটেই এক রকমের নয়। কাঠঠোকরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করল, কিন্তু 'তোমার বাড়ি কোথায় গো'—এই সোজা প্রশ্নটা কাঠুরেকে বোঝাতেই পারল না। কাঠুরে এক-আধবার যদিও মুখ তুলে দেখে, তার পরক্ষণেই আপন মনে কাঠ কেটে চলে ; কাঠঠোকরা যে

তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, তা সে বুঝেছে বলে মনেই হল না।

বেচারা কাঠঠোকরা মনে ভারী কষ্ট পেল। খুব মুষড়ে পড়ল সে। তার বুড়ি কাঠুমা (ঠাকুমাকে ওরা কাঠুমা বলে ডাকে) ঠিক সেটা লক্ষ করে একদিন ওকে ডেকে বলল, "হ্যাঁ রে, তোর কী হয়েছে বল তো। কতদিন তোর কাঠ ঠোকরানোর কচি কচি মিষ্টি শব্দ শুনিনি। তোর কী হয়েছে খুলে বল্।"

কাঠঠোকরা তখন আস্তে আস্তে সব কথাই খুলে বলল কাঠুমাকে। সব শুনে কাঠুমা তার

গালে আদর করে একটু ঠুকরে দিয়ে বলল, "তুই একটা আস্ত কেঠো বোকা। আমায় আগে বলবি তো।"

কাঠঠোকরা তখন বলল, "কোনো উপায় কি আছে কাঠুমা ?"

কাঠুমা গাছের গায়ে তিনবার জোরে ঠোঁট ঠুকে বলল, "আলবত আছে বৈকী। তবে..."

কাঠঠোকরা খুব আগ্রহ করে বলল, "তবে, তবে আবার কী কাঠুমা ?"

বুড়ি কাঠুমা বলল, "তোর সেই কাঠুরে বন্ধুটি কি লোভী ? অবিশ্যি তুই খুবই বাচ্চা, দু-একদিন দেখে আর কী করে বুঝবি।"

কাঠঠোকরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না না. লোকটা বড্ড ভাল কাঠুমা।"

বুড়ি কাঠুমা তখন কাঠঠোকরাকে সঙ্গে নিয়ে উড়তে উড়তে এক দূর বনে গেল। সেখানে অমলতরু জোড়া-গাছের গা জড়িয়ে রং - বেরঙের এক অলখ-লতা উঠে গেছে আকাশের আলোর দিকে। সেই অলখ-লতায় ধরেছে সোনালি রঙের ছোট ছোট সব ফল— অনেকটা কামরাঙার মতো দেখতে। ভারী সুন্দর সেই সব ফল। তাদের গা থেকে নরম আলো বেরিয়ে আসছে। দেখলে চোখ ফেরানোই দায়।

কাঠুমা তখন ওকে বলল, "ভাল করে চিনে রাখ—এই অলখ-লতাকে বলে নিকটমতী। মানুষ পশু পাখি কীট-পতঙ্গ—সবাইকে সবাইকার মনের নিকটে বা কাছে নিয়ে আসে বলে একে বলে নিকটমতী। এই নিকটমতীর ফল যদি কোনো মানুষ খায় পূর্ণিমার দিনে, তবে সে পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারবে। কিন্তু এই শক্তি তার থাকবে মাত্র পনেরো দিন। এই শক্তি নিয়ে যদি কোনো মানুষ লোভী হয়ে পড়ে, যদি...যদি বন্ধুত্ব করার বদলে সে এ দিয়ে ফায়দা তুলতে চায় তবে দুজনের কারুর ভীষণ ক্ষতি হবে। সাবধান! সাবধান! খুব সাবধান!"

কাঠঠোকরা তখন নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার স্বপ্নে মশগুল। তার কানে আর শেষের কথাগুলি ঢুকল না। সে তাড়াতাড়ি বলল, "এখন কী করতে হবে কাঠুমা।"

কাঠুমা বলল, "আগামী কালই পূর্ণিমা। চাঁদ উঠবে সন্ধেবেলা সোনার থালার মতো গোল হয়ে। সন্ধের আগেই নিকটমতীর ফল তুই একটা খাবি আর কাঠুরেকে একটা দিবি, তাহলেই তোর কথা ও বুঝতে পারবে, তুইও ওর কথা বুঝতে পারবি।"

এই বলে নিকটমতীর লতা থেকে দুটি টুসটুসে পাকা গাঢ় সোনালি রঙের ফল ছিঁড়ে এনে কাঠুমা কাঠঠোকরার ঠোঁটে ধরিয়ে দিল।

পরদিন দুপুরবেলা কাঠঠোকরা ফল দুটি নিয়ে হাজির সেই কাঠুরের কাছে। প্রথমে সে নিজে একটা ফল খেয়ে নিল। ফলটা খাওয়ার পরই সে শুনল যে কাঠুরে যেন কী বলছে আপন মনে।

কাছে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করতেই সে বুঝতে পারল যে কাঠুরে বলছে. "উঃ, গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। গলা ভেজাবার মতো যদি কিছু পেতাম!"

কাঠঠোকরা আশ্চর্য হয়ে গেল নিকটমতী ফলের গুণ দেখে। সে আর কিছু না বলে দ্বিতীয় ফলটা টুপ করে ফেলে দিল কাঠুরের সামনে। কাঠুরে অবাক হয়ে হাতের কুড়ুল রেখে এগিয়ে এসে ফলটা তুলে মুখে পুরে দিল। বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেলও। তারপর মুখ তুলে কাঠঠোকরার দিকে তাকাল।

কাঠঠোকরা তখন তার নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাড়ি কোথায় গো ?"

এবার কাঠুরে বলল, "রাজধানী শহর-তলিতে আমি থাকি—এখান থেকে তিন কোশ দূরে।"

কাঠঠোকরা দিব্যি বুঝতে পারল কাঠুরের কথার মানে। সে আবার বলল, "যে-ফলটা খেলে সেটা কেমন লাগল গো ?"

কাঠুরে বলল, "চমৎকার। এর নাম কী ?"

কাঠঠোকরা বলল. "এ হল নিকটমতী ফল। এ খেলে সকলের কথার মানে বোঝা যায়।"

কাঠুরে হেসে বলল, "তাই বল। আমি খালি ভাবছি যে কী করে আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি!"

কাঠঠোকরা বলল, "কী করব বল, তুমি তো আমার কথা বুঝতেই পারছিলে না। আগে যদি এই নিকটমতী ফল খেতে, তবে কবে তুমি আমার বন্ধু হয়ে যেতে।"

কাঠুরে বলল, "তা যাকগে। আজ থেকে তুমি আমার মিতে।"

কাঠঠোকরাও বলল, "আজ থেকে তুমিও আমার মিতে।"

এমনি করে দিন যায়। কাঠুরে কাঠ কাটে আর কাঠঠোকরার সঙ্গে গল্প করে।

বেশ সুখেই দিন কাটছে তাদের। একদিন হয়েছে কী, রাজবাড়ির অতিথি-নিবাস থেকে এক বিদেশী বণিকের দামি দামি সব মণি-মুক্তো চুরি হয়ে গেল। রাজামশাই দশ হাজার মোহর পুরস্কার ঘোষণা করলেন চোরের খবর দেবার জন্য। চারদিকে ঢ্যাঁড়া পেটানো হল।

সকালবেলা উঠে গোলপুকুরে চান করে ফেরার সময় কাঠুরেও শুনল সেই ঘোষণা। শুনে সে মনে মনে বলল, উঃ দশ হাজার মোহর যে অনেক। দশ হাজার মোহর পেলে আর আমাকে কাঠ কাটার পরিশ্রম করতে হয় না।

তক্ষুনি পুকুরের পাশের মহানিমগাছের ডালে দুটো কাক ডেকে উঠল। কাঠুরে বুঝতে পারল ওরা কী বলছে। সে একটা ছল করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল ওরা কী বলে। কী কাণ্ড, কী কাণ্ড! কাঠুরে স্পষ্ট শুনতে পেল কাকেরা বলছে—"মজা দ্যাখ, যে লোক দুটো ঢ্যাঁড়া দিচ্ছে ওরাই চুরি করেছে, আবার ওরাই কিনা ঘটা করে ঢ্যাঁড়া দিচ্ছে!"

শুনেই কাঠুরে দৌড়ে গিয়ে রাজামশাইকে বলে দিল খবরটা। চোর পড়ল ধরা। আর সে পেয়ে গেল নগদ দশ হাজার মোহর। মহানন্দে ভর্তি থলি নিয়ে কাঠুরে বাড়ি ফিরে মাটির নীচে পুঁতে রাখল সব মোহর। আর বনে গেল না কাঠ কাটতে।

ওদিকে কাঠঠোকরা পাখির শরীর তখন যেন কী কারণে নেতিয়ে পড়েছে। পাখিদের রাজ্যে দারুণ শোরগোল—কী হল? কেন হল?

বদ্যিপাখি এসে সব দেখে বলল, "হায়! হায়! এ যে নিকটমতী ফলের সঙ্গে টাকার লোভ মিশে বিষ হয়ে গেছে। আর নিরীহ সরল প্রাণী বলে সব বিষ এসে ওকে ভয়ঙ্কর বিষিয়ে দিয়েছে। ও যে আর বাঁচবে না!" পাখির ভাষা জেনে কাঠুরে যখন মোহরের লোভ মেটাচ্ছে, তখন সে জানতেও পারল না যে তারই লোভের জন্য তার ভালবাসার বন্ধু বিদায় নিতে বাধ্য হল এই পৃথিবী থেকে। কাঠুমা শুধু নিজের বুকের হাড়ে ঠক-ঠক করে ঠোঁট ঠুকে বলতে লাগল, "হায় হায় হায়!"

ছবি শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

# দাবা

তাভীক বসু

রবিবারের দুপুর বেলা
পিসে এবং বাবা
খেলেন বসে দাবা।

রাজা, মন্ত্রী, বোড়ে
খেলুড়েদের হাতের চালে
এদিক-ওদিক ঘোরে।

চৌকো দাবার ছকে
জমজমাটি চলছে খেলা
মিত্তিরদের রকে।

উত্তেজনা চরম!
কখনও বা ঠাণ্ডা মাথা,
কখনও বা গরম।

শেষে
একটুখানি হেসে
পিসে দিলেন কিস্তি,
যেমন তাঁকে শিখিয়েছিলেন
ঢাকার হারান মিস্ত্রি।

হেরে গেলেন বাবা,
গর্ব হল পিসার।
বলেন ডেকে, "আন না তোরা
কারপোভ বা ফিশার।
আমিও সেথায় যেতে পারি
সমস্যাটি ভিসার।"

ছবি রতন সেন

## উদয়পুরে

আমরা এবার পুজোর ছুটিতে রাজস্থান গিয়েছিলাম। উদয়পুরের অনেক জায়গায় আমরা ঘুরেছিলাম। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল পিছোলা লেক। ঐ লেকের জলে আমি যখন মুড়কি, ছোলা ফেলছিলাম, তখন অজস্র মাছ এসে সেগুলো কপ্‌কপ্‌ করে খেয়ে ফেলছিল। আমার ঐ দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল।

সেখান থেকে আমরা বোটে করে নেহরু পার্কে গেলাম। চারিদিকে রাশি রাশি জল, মাঝখানে নেহরু পার্ক, পার্কটি সুন্দর। নেহরু পার্কের সব থেকে মনোরম দৃশ্য হচ্ছে অসংখ্য ফোয়ারা। কোনো জায়গায় হাতির শুঁড় দিয়ে জল পড়ছে। কোথাও বাঘের মুখ থেকে, কোথাও আবার বিরাট বিরাট মাছের মুখ থেকে জল পড়ছে। এগুলি সবই পাথরের তৈরি। নেহরু পার্কে নানারকমের সুন্দর ফুল ফুটে ছিল। আমরা পার্কে থাকতে থাকতে সন্ধে হয়ে গেল। তখন ফোয়ারার চারপাশে লাল, নীল, সবুজ আর হলুদ আলো জ্বলে উঠল। ঐ আলো ফোয়ারার জলকে রঙিন করে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যে আছি।

**মনোজিৎ মিত্র** (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে **শিউলি বাগ** (বয়স ৮)

## মিতুল

টুকুনমাসির দুটি মেয়ে যেন রূপের ডালি। শুধু কি রূপের ডালি, কথারও ফুলঝুরি। সেবার পুজোর ছুটির আগে আমাদের স্কুলে টুকুনমাসির বড় মেয়ে মিতুল এল মাসির হাত ধরে। আমাদের ক্লাসে ঢুকেই বলল, "তোমরা আগে আমাকে দেখনি?"

আমরা সবাই একসঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও আবার বলে উঠল, "কেন দেখনি? সেবার যে ছুটির আগের দিন মাসির সঙ্গে তোমাদের এই ঘরে এসে বসলাম। একটা ম্যাক্সি পরে এসেছিলাম। তাও মনে

পড়ছে না? জানো, সেই ম্যাক্সিটা বোন নিয়ে নিয়েছে।"

এমনি অনর্গল কথা বলে মিতুল। এরকম অনেক কথা ও সকলকে বলে বেড়ায়।

আর একদিন ও আবার মাসির হাত ধরে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। বারান্দা থেকে ঘর, ঘর থেকে ফুলের বাগান—সব ঘুরে-ফিরে দেখে এসে বলল, "দীপাদিদি, তোমার বোন কোথায়?"

আমি বললাম, "আমার তো বোন নেই। আমার একটাই ভাই।"

ও শুনে হেসেই গড়াগড়ি। বলল, "তাই নাকি? আমার তো একটা ভাই আছেই, তার ওপর একটা বোনও আছে।"

**দীপা সরকার** (বয়স ১৩)

ছবি এঁকেছে **মনামি রায়** (বয়স ১০)

## ঘুরে এলাম বীরসিংহ

আমাদের স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বারো দিন ছুটি দেওয়া হয়েছিল। আমি এই ছুটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ দেখতে বাবার সঙ্গে ঘাটালে গিয়েছিলাম।

ঘাটালে তখন যুব-উৎসব চলছিল। আমরা রোজ রাত্রে উৎসব দেখতে যেতাম। একদিন রাত্রে এত ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল যে, বাড়ি ফিরে আসতে কষ্ট হয়েছিল আমাদের। পরদিন সকালে বীরসিংহে যাব বলে ঠিক হয়েছিল; কিন্তু বাস আসতে দেরি হয়েছিল বলে সেদিন যাওয়া হল না। ঠিক হল, পরদিন বিকেলে বীরসিংহে যাব। পরদিন বিকেলে তো বাসে করে রওনা হলাম। আধ ঘণ্টা পরে বাস থেকে নেমে একটি রিকশায় চড়ে বীরসিংহে গিয়ে পৌঁছলাম।

সেখানে দেখলাম বাগানের মালীরা ফুল-গাছে সার আর জল দিচ্ছে। বাগানের এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানটি শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের ভিতরে আছে বিদ্যাসাগরের অনেক বই, আর আঁকা রয়েছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বহু ছবি।

সেখান থেকে আমরা আর একটা বাড়িতে গেলাম। সেখানে বিদ্যাসাগরের মানিব্যাগ পেপারওয়েট, হাতের লেখা আর মোমবাতি নেভানোর জন্যে ঢাকনার মতো একটা জিনিস দেখলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও ছাত্রাবাস দেখলাম। তারপর ঘাটাল হয়ে আবার ফিরে এলাম কলকাতায়।

**অঞ্জনা ভট্টাচার্য** (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **শান্তনু মণ্ডল** (বয়স ১২)

# উপমার ডিগবাজি

**কুম্ভক**

শরৎচন্দ্রের সেই ঠাট্টাটার কথা মনে আছে তো? ওই যে, মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু কারও একগাছি চুলও দেখা গেল না। মনে পড়ছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। দাদা সেদিন শোনাচ্ছিল তো?

কেন ওটা বললেন শরৎচন্দ্র?

নন্তু বলল : মনে পড়েনি, তাই বললেন।

মনে যদি না পড়েছে তো কথাটা উঠলই বা কেন হঠাৎ? মনে তো পড়েইছে তাহলে।

টুম্পি নন্তু ধাঁধায় পড়ল একটু, কী উত্তর দেবে ঠাহর পেল না।

ব্যাপারটা কী জানিস, ব্যবহার করতে করতে কথা বলবার একটা মুখস্থ ধরন দাঁড়িয়ে যায়। মুখ বললেই চাঁদের কথা, চুল বললেই মেঘের কথা, আঙুল বললেই চাঁপার কলি, হাত বললেই পদ্ম।

নন্তু মনে করিয়ে দেয় : এমনকী পা বললেও। বিজয়ার চিঠিতে শ্রীচরণকমলেষু লিখতে লিখতে হাতের পদ্ম ব্যথা হয়ে গেল।

ঠিক। সেই ব্যাপারটাকেই ঠাট্টা করতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু এর মধ্যে আরো একটা ডিগবাজির ব্যাপার আছে।

ডিগবাজি?

হ্যাঁ, ডিগবাজি। আমি যদি বলি, মেঘের মতো কালো চুল, তাহলে সেটা উপমা হল। না? আর যদি বলি, চুলের মতো কালো মেঘ তাহলে?

উপমাই হবে। হবে না?

উপমাই একরকম। তবে একটা ডিগবাজি দেখলি না এখানে? সচরাচর যেটাকে উপমান হিসেবে দেখি, মানে, তুলনা করা হয় যা দিয়ে, সেই মেঘটাই এখানে হয়ে গেল উপমেয়। জায়গাবদল হল না একটা? এই ডিগবাজির জন্য আলাদা একটা নাম দেওয়া যায় কিন্তু। তখন তাকে বলা যায় প্রতীপ।

প্রতীক?

প্রতীক নয়, প্রতীপ।

মানে?

এর মানেই হল উল্টো, বিপরীত। জ্যামিতিতে পড়িসনি বিপ্রতীপ কোণ? সেই প্রতীপ।

কবিতা বলো তো এ-রকম।

কবিতা? আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটা মনে আছে? সেই যে জাবাল সত্যকামের গল্প? সেখানে আছে :

নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী

বাকিটা বলব না। কী হবে বল তো? কিসের মতো বসে আছে তারাগুলি?

তা বলতে পারলে তো আমরাই রবীন্দ্রনাথ হয়ে যেতাম।

তাও তো কথা। আচ্ছা, তবে বলেই দিই পরের অংশ : 'নিঃশব্দ শিষ্যের মতো'। তারাগুলি শিষ্যের মতো? একটু উল্টো করে বলা হল না? কবিতার মধ্যে গুরুশিষ্যের পড়াশোনার ছবিটা আছে বলেই তো এই তুলনাটা মনে হতে পারল? কিংবা ধর, ও'র আরেকটা কবিতার লাইন

আজি বর্ষা গাঢ়তম
নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

এই আমরা ফিরে এলাম শরৎচন্দ্রের সেই ঠাট্টায়। চুলের মতো নিবিড় মেঘ নেমে আসছে, রবীন্দ্রনাথ তাহলে দেখেছিলেন সেটা। অথবা ধর, একজন আধুনিক কবির লাইন, 'পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ'—

উপমা নয় এগুলো?

উপমাই তো, তবে কিনা একটু বিশেষ ধরনের উপমা, উল্টে দেওয়া।

বুঝেছি। ডিগবাজি খাওয়া। তাই প্রতীপ। কিন্তু কাকু, এত কিছু বুঝতে গেলে আমাদেরও কি ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে হবে না?

(ক্রমশ)

# ছুটির দিনের ভাবনা

প্রসাদ

ঘুম ভেঙেছে, আলস্য কাটেনি। চামেলির মা ছাড়া সবাই এখনো বিছানায়।

Only mother's up and about.
Other s are still in bed.

হলই বা ছুটির সকাল, মায়ের কি উপায় আছে বিছানায় শুয়ে আলস্য উপভোগ করবার? এক্ষুনি রাক্ষুসে খিদে নিয়ে ছেলে-মেয়েরা জেগে উঠবে না? ধোপা আসবে একটু পরে, তার জন্যে ময়লা জামাকাপড় ঠিক করে রাখতে হবে। বাজারে যে যাবে তাকে ফর্দ বুঝিয়ে দিতে হবে। মায়ের কি কোনো ছুটি আছে?

The children will soon be up.
They'll be very hungry.
They'll want large breakfasts.
The dhobi will call for the dirty linen.
The bread-van will arrive with fresh loaves.
The milk-man will bring milk.
Mother'll have a thousand things to see to before the others are awake.

এবারে দেখি অন্যেরা কী করছে। কিন্তু তার আগে, বলো তো, এই কথাগুলোর মানে বুঝতে পেরেছ তো?

Mother's up and about.
The dhobi will call.
Mother'll have a thousand things to see to.

চামেলি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবছে :

I won't (will not) get up now.
I won't get up till Ara comes and calls me.
Will Ara come?
Will she call me?
I'm afraid she won't.
She won't ever come back.

I'll (I shall) be so unhappy if Ara doesn't come back.
I'll have no one to play with.

চম্বলের ভাবনা :

I hope it doesn't rain today.
If it rains it'll (it will) spoil my holiday.
I shan't (shall not) be able to go out.
Mother won't let me.
My friends won't be able to come to my house.
I'll (I shall) be bored.
If it's fine I'll (I will) go to Kunal's house. Kunal and his sister Malabika and I will have a picnic. Won't (will not) it be nice if we can have the picnic?

এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ :

I'll = I will; I'll = I shall; I won't = I will not.
I shan't = I shall not; They'll = They will.

ফোটো দেবীপ্রসাদ সিংহ

# শূন্য দিয়েই শুরু

## রঞ্জিতকুমার ঘোষ

জীবনের প্রথম টেস্ট ইনিংসটিতেই শূন্য রান করার মানে যদি খেলোয়াড়-জীবনের ইতি হ'ত, তাহলে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড়কেই আমরা পেতাম না। ভারতীয় টেস্ট দলের পক্ষে অপরিহার্য ডান-হাতি মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান খর্বাকৃতি গুণ্ডাপ্পা রঙ্গনাথ বিশ্বনাথকেও না। ১৯৬৯-এর ১৫ নভেম্বর কানপুরের গ্রীন পার্কে দ্বিতীয় টেস্টে বিল লরির অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শূন্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই শূন্য তাঁর জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রমাণ দ্বিতীয় ইনিংসেই দেন ১৩৭ রান করে। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ও অ্যালান কনোলীর পেস কিংবা অ্যাসাছি মালেট-এর স্পিনকে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম করেননি প্রথম ইনিংসে গোল্লা-খাওয়া নবাগতটি।

ভারতীয় ক্রিকেটে রসিকতার একটা প্রবাদ আছে : যে ভারতীয় ব্যাটসম্যান আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছেন, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার তিন অঙ্কে পৌঁছতে হয়নি। লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলি বেগ, হনুমন্ত সিং আর সুরিন্দর অমরনাথের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা হয় সেই ব্যাটসম্যান হারিয়ে বা ফুরিয়ে যাবেন। একমাত্র বিশ্বনাথই ঐ জুজুর ভয় ভেঙে দিয়েছেন। ১৯৬৯-এর এই টেস্টটির পর থেকে সেপ্টেম্বরে বাঙ্গালোর টেস্ট পর্যন্ত আরও ন'টি সেঞ্চুরি তিনি করেছেন আরও ৫৭টি টেস্ট খেলে। মোট রান করেছেন ৪,৪১৯ (গড় ৪৬·৫১)। এর মধ্যে হাফ-সেঞ্চুরি আছে সাতাশটি। শুধু তাই নয়, উপর্যুপরি ৫৪টি টেস্ট খেলে তিনি এখন এক ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী। মোট টেস্ট খেলার দিক থেকে অবশ্য ভারতে এখনও বেদী (৬৭) সবার উপরে।

অবশ্য রেকর্ড বা পরিসংখ্যানের কথা আপাতত থাক। ওগুলো দিয়ে বিশ্বনাথের মতো ব্যাটসম্যানদের মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

'বিশ্বনাথ' বললে আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই যা ভেসে ওঠে তা হল কিছু চোস্ত মারের ছবি। স্কোয়ার-ড্রাইভ বা স্কোয়ার-কাট। কিংবা কভার-ড্রাইভ। বস্তুত, স্কোয়ার-অব-দা উইকেট অঞ্চলে মারতেই ভালবাসেন সতীর্থদের আদরের 'ভিশ' বা ভিশি'। অবশ্য অন্য অঞ্চল দিয়ে এবং অন্যরকম মার মারতে তিনি পিছপা নন এবং মারেন সুন্দরভাবেই। তিনি ক্রিকেটের একজন জাত আর্টিস্ট। ভারতে ইদানীং এত চমৎকার স্ট্রোকপ্লেয়ার আর দেখা যায়নি এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কলকাতার দর্শকদের হৃদয় তো বিশ্বনাথ সেই ১৯৬৯-এই জিতে নিয়েছেন। স্বয়ং সানি গাভাসকারও বোঝেন তাঁর ভগ্নীপতিটি ইডেনের কত প্রিয়। এই জনপ্রিয়তা—ইডেনে বা অন্য যে-কোনো জায়গায়—হঠাৎ আসেনি। বিশ্বনাথের সংগ্রামী মনোভাব, ক্লাসিকাল ছন্দ এবং রকমারি চোখজুড়োনো মারই তাঁকে জনপ্রিয় করেছে। তিনি যতটুকু সময়ই ক্রীজে থাকুন না কেন, সমস্ত রকম আক্রমণের বিরুদ্ধেই তিনি প্রাধান্য বিস্তার করে প্রতিপক্ষ বোলারের হৃদয় বিদীর্ণ করেন, বোলাররা কখনো তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। অবশ্য কারো কারো মতে স্পিন খেলাতেই তাঁর মহিমার সার্থকতর প্রতিফলন দেখা যায়।

বিশ্বনাথ তাঁর নামের দেবতাটির মতোই পুজো পেয়েছেন ক্রিকেট-ভক্তদের কাছে। দেবতাটির মতোই তিনি বিপদ-ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কতবার। কতবার ম্যাচ জিতিয়েছেন। ১৯৭৪-৭৫-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায় ১৩৯ আর মাদ্রাজে অপরাজিত ৯৭ কিংবা গত বছর তাদেরই বিরুদ্ধে মাদ্রাজেই ১২৪ ভারতকে এনে দিয়েছিল জয়ের সম্মান। আর ১৯৭৪-এ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে না পারলেও যে ৫০ রানের ইনিংসটি খেলেছিলেন তার কথা ভুলি কী করে? কিংবা এ-বছরেই বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯০ রানের ভারতীয় ইনিংসে বিশ্বনাথের ৭৫-কে?

নিজের অজ্ঞাতসারে আবার পরিসংখ্যানেই এসে পড়েছি! তা, পরিসংখ্যানের দিক থেকেও বিশ্বনাথ কম যান না। টেস্ট দলে আসার আগে প্রথম ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাচেও তিনি সেঞ্চুরি করেছেন—১৯৬৭-৬৮ মরসুমে বিজয়বাড়ায় অন্ধ্রের বিরুদ্ধে ২৩০। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো ক্রিকেটার প্রথম ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাচ ও প্রথম টেস্ট এই দুটিতেই সেঞ্চুরি করতে পারেননি!

বহুদিন পর্যন্ত ঐ ২৩০-ই ছিল বিশ্বনাথের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর। ১৯৭৭-৭৮-এ মোহননগরে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফি ফাইনালের ২৪৭-ই এখন তাঁর প্রথম শ্রেণীর খেলায় সর্বোচ্চ সংগ্রহ। আর টেস্টে তিনি তাঁর সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ১৭৯, গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। আবার কানপুরেই।

বিশ্বনাথই প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি টেস্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের বিরুদ্ধে (বলা বাহুল্য, এ-হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা বাদ) সেঞ্চুরির দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর অল্পদিন পরে গাভাসকার এই রেকর্ড করেন। বিশ্বনাথের সেঞ্চুরি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে চারটি, ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি করে, আর পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি করে।

সেঞ্চুরির কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বিশ্বনাথ সেঞ্চুরি করেছেন অথচ ভারত হেরেছে এমনটি একবারও ঘটেনি। এ-ভাগ্য কুড়ি-সেঞ্চুরির নায়ক গাভাসকারেরও হয়নি।

বিশ্বনাথ একজন নির্ভরযোগ্য স্পিন ফিল্ডসম্যানও বটে। টেস্টে এ-পর্যন্ত তিনি ৪১টি ক্যাচ ধরেছেন। বিশ্বনাথের জন্ম হয় মহীশূরের ভদ্রাবতীতে ১৯৪৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি। তিনি বাঙ্গালোর স্টেট ব্যাংকের অফিসার।

বিশ্বনাথ সম্বন্ধে দু' একটা টুকরো কথা বলে শেষ করি। বিশ্বনাথের ব্যাটিং ক্রিকেটের মতোই অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। কেউ বলতে পারে না তিনি কখন কীভাবে আউট হবেন। মজার কথা হ'ল, দেখা যায় অনেক সময় দলের বিপদত্রাতা হলেও অন্য সবাই যখন ভাল খেলছেন তখন বিশ্বনাথ ভাল রান পান না। বিশ্বনাথকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ''প্যাড পরে ফেলার পরই মাঠের খেলাটা দেখা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। উইকেটে আগের দুই ব্যাটসম্যান যদি লম্বা রানের জুটি বাঁধেন তাহলে খেলা দেখতে দেখতে আমার মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। আমি তো একটা মানুষ বৈ কিছু নয়। কেউ কি আর অনেকক্ষণ একমনে খেলা দেখতে পারে? কাজেই ঐ রকম পার্টনারশিপের পর আমি খেলতে গেলে আমার হাত জমাতে একটু সময় লাগে। আর.....ঐ সময়ের মধ্যেই আমার উইকেট খোয়া যাবার ভয় থাকে। কিন্তু আগের উইকেটটা তাড়াতাড়ি পড়ে গেলে আমিও সহজেই খেলায় মন বসাতে পারি, রানটান পাই!''

---

পুনশ্চঃ লেখা প্রেসে পাঠাতে-পাঠাতে কলকাতা টেস্টও শেষ হয়ে গেল। কাজে কাজেই বিশ্বনাথের সব পরিসংখ্যানও বদলে গেছে। কলকাতা টেস্ট পর্যন্ত মোট ৬১টি টেস্ট (উপর্যুপরি ৫৭) খেলে বিশ্বনাথ ৪,৭৪৯ রান করেছেন। গড় ৪৭.৪৯। সেঞ্চুরি করেছেন ১১টি, হাফ-সেঞ্চুরি ২৯। ক্যাচের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২। (এই সংখ্যা পাঠকপাঠিকাদের হাতে গিয়ে পড়ার আগে বোম্বাইয়ে ষষ্ঠ টেস্টও শেষ হয়ে যাবে; বলা বাহুল্য আবার নতুন করে হিসেব করতে হবে তখন।) এ-ছাড়া, দিল্লিতে বিশ্বনাথ তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেট পেয়েছেন। আর কানপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যক্তিগত পঞ্চদশ রানটি করামাত্রই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সহস্র রান পূর্ণ হয়ে যায়, যা আর কোনও ভারতীয় ব্যাটসম্যান এখনও করতে পারেননি।

# নাটকে-ভরা ক্রিকেট

## অলোক দাশগুপ্ত

অনেকের আশঙ্কা ছিল বৃষ্টি এসে হয়তো এবারের কলকাতা টেস্ট বানচাল করে দেবে। অনেকে আবার নাক সিঁটকে মন্তব্য করেছিলেন : দূর এই গরমে কি কেউ খেলা দেখতে যায়। কিন্তু অক্টোবরের ভ্যাপসা গরমকে উপেক্ষা করে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেস্ট দেখতে যাঁরা ইডেনে হাজির হয়েছিলেন, ক্রিকেট তাঁদের বঞ্চিত করেনি। না, এবারের অসময়ের কলকাতা টেস্টে শীতের মিঠে স্বাদ বা বড়দিনের ছুটির মেজাজ উপভোগ করা যায়নি। এমনকী, পাঁচদিনের টেস্ট শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গেছে। কিন্তু জয় হয়েছে ক্রিকেটের, যার আর এক নাম মহান অনিশ্চয়তার খেলা।

খেলার শুরুতে ঘাসবিহীন পিচ দেখে গাভাসকার কিংবা হিউজ কেউই খুশি হতে পারেননি, বেশ বোঝা যাচ্ছিল এই 'মরা' উইকেটে টেস্ট জমে উঠবে না। কিন্তু সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ম্যাচের চতুর্থ বলে হিলডিচকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে কপিলদেব যেন খেলায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন। তবে এই উত্তেজনা সাময়িক। প্রথম তিন দিনের খেলা দেখে দর্শকদের মোটেই মন ভরেনি। হাই তুলতে-তুলতে তাঁরা দেখেছেন ৫২২ মিনিট ধরে অবলীলাক্রমে ক্রিজে থেকে ত্রুটিমুক্ত ১৬৭ উপহার দিলেন গ্রাহাম ইয়ালপ, অধিনায়কের ইনিংস খেললেন কিম হিউজ, গাভাসকার এবং বিশ্বনাথকে বাদ দিয়েও ভারতীয় ব্যাটিং যে তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারে, তার প্রমাণ রাখলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। এরই মধ্যে আশি হাজার দর্শক হঠাৎ হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন, যখন হিউজ বা বেঙ্গসরকার ছয় হাঁকিয়েছেন।

চতুর্থ দিন অনেকেই মাঠে হাজির হয়েছিলেন জোড়া সেঞ্চুরি এবং কপিলদেবের মারমুখী ব্যাটিং দেখার আশা নিয়ে। মাত্র ছয় এবং এগারো রানের জন্য বিশ্বনাথ এবং

যশপাল (বেপরোয়া ব্যাটিং) ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

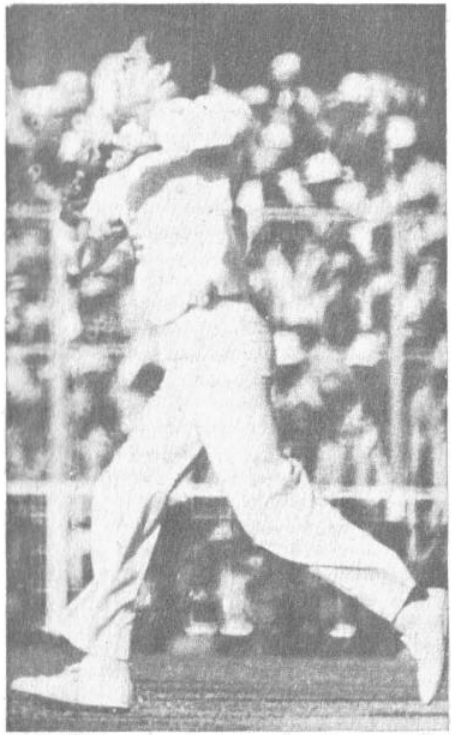

দোশী (স্পিনের জাদু) ফোটো তারাপদ ব্যানার্জি

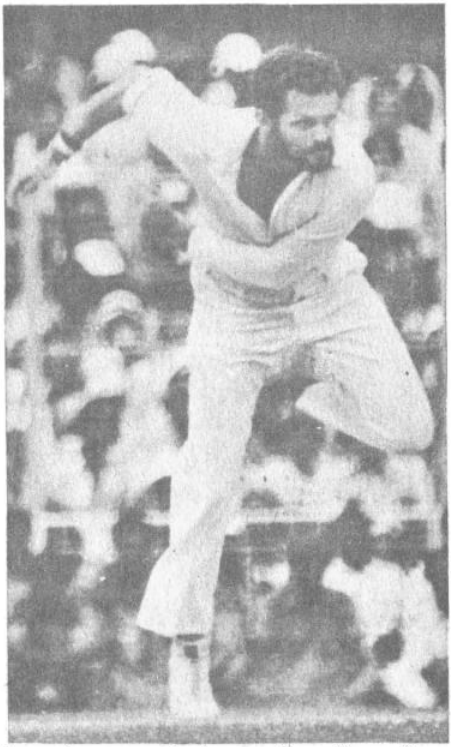

ডিমক (চমকপ্রদ বোলিং) ফোটো দেবীপ্রসাদ সিংহ

বেঙ্গসরকার সেনচুরি করতে পারেননি। সরাসরি বোলারের মাথার উপর দিয়ে একটি অনবদ্য ছয় মেরেছেন কপিলদেব, কিন্তু তিনিও উইকেটে টিঁকে থাকতে পারেননি। তবু চতুর্থ দিনের খেলা দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়েছে। চরম উত্তেজনার মধ্যে তাঁরা দেখেছেন, টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য কীভাবে একবার অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে আর তারপরেই ভারতের অনুকূলে যাওয়া-আসা করছে।

অস্ট্রেলিয়ার ৪৪২ রানের জবাবে ৩৪৭ রানে ভারত প্রথম ইনিংস শেষ করে। চতুর্থ দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতির কিছু পরে অফ-স্পিনার ইয়ারডলি দারুণ বল করে চারটি উইকেট দখল করেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল উইকেটে এবার স্পিন ধরতে শুরু করবে।

চা-বিরতির ঠিক আগের ওভারে গাভাসকার বলে তুলে দিলেন বাংলার ন্যাটা স্পিনার দিলীপ দোশীর হাতে। ছয় বলের মধ্যে চার-বারই ব্যাটসম্যান হিলডিচ পরাস্ত হলেন। কিছু আগে ইয়ালপকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রথম ইনিংসের বোলিং হিরো (পাঁচটি উইকেট) কপিলদেব। টের পাওয়া গেল, চতুর্থ দিনের শেষের দেড়ঘন্টা কিছু বিস্ময় অপেক্ষা করছে। হলও তাই। দিনের শেষে মাত্র ৮১ রানে অস্ট্রেলিয়ার সেরা পাঁচ ব্যাটসম্যান আউট। এবং এর জন্য অনেকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন দোশী। প্রথম ইনিংসে চারটে উইকেট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে পেলেন আরও দু'টি। সহায়ক পিচে চতুর্থ দিনে তাঁর বোলিংয়ের তুলনা হয় না।

আশা-নিরাশায় দুলতে-দুলতে দর্শকরা পঞ্চম দিনের খেলা দেখতে হাজির হয়েছিলেন। দিনের প্রথম ওভার থেকেই মারমুখী হিউজ এবং ইয়ারডলি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা জয়ের কথা ভাবছেন। লাঞ্চের কিছু আগে ছয় উইকেটে ১৫১ রান করে হিউজ দান ছেড়ে দিলেন।

১৮৫ মিনিট এবং বাধ্যতামূলক ২০ ওভারে ২৪৭ রান করে ম্যাচ জেতা ভারতের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু জয় সম্ভব হয়নি, ২২ বল থাকতে যশপালের আবেদনে আলোকাভাবে যখন খেলা শেষ হয়, তখন ভারতের দরকার ছিল মাত্র ৪৭ রান, হাতে ছয় উইকেট।

এক সময়ে অল্প রানে গাভাসকার, বেঙ্গসরকার এবং বিশ্বনাথের উইকেট হারিয়ে ভারত ম্যাচ প্রায় হারতে বসেছিল। সামাল দিয়েছেন চৌহান এবং যশপাল। গাভাসকার আর ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই চৌহান আউট হলে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন নরসিমা রাওকে। পঞ্চম দিনের পড়ন্ত বেলায় যশপালের ব্যাট থেকে যখন রানের ফুলঝুরি ঝরে পড়েছে তখন অনেকেই মন্তব্য করছিলেন, অন্যপ্রান্তে কপিল থাকলে ভারত নিশ্চয় ম্যাচ জিতত।

অস্ট্রেলিয়া একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে-ছিল, অনেকে মনে করেন ভারত সেই চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু অক্টোবরের শেষ দিনের শেষ বেলায় যে অনবদ্য ৮৫ রানের ইনিংস উপহার দিলেন এক পাঞ্জাবী যুবক, ইডেনের দর্শক তার স্মৃতিটিকে দীর্ঘকাল মনের মণিকোঠায় যত্ন করে রেখে দেবে। শুধু দুঃখ থেকে গেল, যশপাল শেষ পর্যন্ত সেনচুরি করার ঝুঁকিটি নিলেন না।

# রাবার জয়

## শ্যামসুন্দর ঘোষ

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত রাবার লাভ করল। ১৯৩২ সালে লর্ডস টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেটের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সার্থক পরিণতি ঘটল এবার ওয়ানখাড়ে স্টেডিয়ামে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের খেলায় ভারত জিতল দুটি টেস্টে। প্রথমে কানপুরে ১৫৩ রানে এবং বোম্বেতে শেষ টেস্টে ইনিংস ও ১০০ রানে। অতীতে আরও একবার ভারত অস্ট্রেলিয়াকে দুটি টেস্টে পরাজিত করেছিল। এমন-কী ইনিংসেও জিতেছিল একটি টেস্টে।

১৯৭৭—৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত মোট পাঁচটি টেস্টের পাঁচটিতেই ভারত জয়লাভ করলে অবাক হওয়ার কিছুই ছিল না। ঐ সফরে প্রথম টেস্টে ভারত হেরেছিল মাত্র ১৬ রানে। দ্বিতীয় টেস্টে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে ভারত পরাজিত হয় দুই উইকেটে। কিন্তু মেলবোর্ন ও সিডনিতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী দুই টেস্টে ভারত জয়লাভ করে অনায়াসে। তৃতীয় টেস্টে ভারত জিতেছিল ২২২ রানে। চতুর্থ টেস্টে ইনিংস ও দুই রানে। দুটি টেস্টে পিছিয়ে থেকে খেলার ফলাফলে সমতা আনলেও এডিলেডে পঞ্চম ও চূড়ান্ত টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৪৭ রানে জয়লাভ করায় ভারতের আর রাবার লাভ করা সম্ভব হল না। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অধিনায়ক সিম্পসন ও গ্রাহাম ইয়ালোপ সেঞ্চুরি করেছিলেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা দ্বিতীয় ইনিংসে খুব ভাল খেলেছিলেন। জয়ের জন্যে প্রয়োজন ছিল ৪৯২ রান। ভারত করেছিল ৪৪৫।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের ওটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রানের ইনিংস। ওই এডিলেডেই ১৯৪৭—৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার ৬৭৪ রান এখনও পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে তাঁদের টেস্টের সর্বোচ্চ রান। সেই খেলায় ব্রাডম্যান করেছিলেন ২০১, লিন্ডসে হ্যাসেট ১৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। সিড বার্নসের রানসংখ্যা ছিল ১১২। ভারত ঐ খেলায় ইনিংসে পরাজিত হয়েছিল কিন্তু বিজয় হাজারের উভয় ইনিংসে শত রান (১১৬ ও ১৪৫) ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬জন ভারতীয় খেলোয়াড় কোনো রানই সংগ্রহ করতে পারেননি।

এবারের অস্ট্রেলিয়া দল ১৯৭৭-৭৮ সালের সেই অস্ট্রেলিয়া দলের মতোই। তবে সেবারে অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বব সিম্পসন। অস্ট্রেলিয়া এবছরের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের কাছে ছটি টেস্টের মধ্যে পাঁচটিতে পরাজিত হয়েছে। জিতেছে শুধু একটিতে। পাকিস্তানের কাছে দুটি টেস্টের একটিতে জিতেছে, হেরেছে একটিতে।

ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি করে টেস্টে জয়লাভ করলেও ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে ভারতের প্রাধান্য ছিল সবসময়। বোম্বের শেষ টেস্টে

গাভাসকার (২২তম সেঞ্চুরি)

কিরমানি (প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি)

ঘাউড়ি

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা আট-ন'টি ক্যাচ ফেলেছেন। সুযোগ ভালভাবে কাজে লাগিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা। গাভাসকার শত রান পূর্ণ করেছেন। জীবনে প্রথম শত রান করেছেন উইকেটরক্ষক কিরমানি। ঘাউড়ি তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ রান করেন এই টেস্টে—৮৬। অস্ট্রেলিয়ার দুর্ভাগ্য যে, তাঁদের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ডার্লিং কপিলের বলে আঘাত পেয়ে আর ব্যাট করতে পারেননি। এবছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে বব উইলিসের বলে ডার্লিং মাথায় চোট পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। শেষের দিকে তিনি অবশ্য ব্যাট করতে নেমেছিলেন আবার।

কিরমানির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল টেস্টে শত রান করা। গত বছর বাঙ্গালোরে বাংলা ও কর্ণাটকের খেলার সময় কিরমানি আমাকে তাঁর মনের দুঃখ জানিয়েছিলেন। ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "রনজি ট্রফিতে তো সেঞ্চুরি করেছেন। টেস্টে কি আপনি শুধুই উইকেটরক্ষক হিসেবে পরিচিত থাকবেন? আপনার হাত থেকে সেঞ্চুরি দেখতে পাব না?"

পাশে ছিলেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ কর্ণাটকের অধিনায়ক। রসিকতা করে বলেছিলেন, "কিরমানি ভাল নাইট ওয়াচম্যান।" চন্দ্রশেখর ও ব্রিজেশ পাটেল বিশ্বনাথকে সমর্থন করেছিলেন। পরক্ষণেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কিরমানি আধঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, ওঁকে ইচ্ছে করেই শেষের দিকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়। ভারতের মাঝের সারির ব্যাটিংয়ের যা অবস্থা তাতে তিনি যে-কোনও ব্যাটসম্যানের আগেই ব্যাট করতে যেতে পারেন।

বোম্বেতে কিরমানির শতরানের পরে মনে পড়ল বিশ্বনাথ ও কিরমানির কথা। বোম্বেতে কিরমানি ব্যাট করতে নেমেছিলেন নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে। আর ঐ ভূমিকায় কিরমানি যে দক্ষ তার প্রমাণ তাঁর অপরাজিত ১০১ রান। বোম্বের টেস্ট ছিল কিরমানির জীবনের পঁয়ত্রিশতম টেস্ট। ১৯৭৬-৭৭ সালে বোম্বের এই ওয়ানখাড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৮ রানই ছিল এতদিন পর্যন্ত তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ রান।

---

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

# ভারতীয় ফুটবলের জয়জয়কার

শ্যামল ব্যানার্জি

## অশোক দাশগুপ্ত

বোম্বের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে ভারতীয় ফুটবলাররা যখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দিকে উড়লেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন না। নির্বাচিত সতেরোজনের একজন হয়েও মনোরঞ্জন যেতে পারলেন না। পাসপোর্টের অভাবে। অভাবে মানে ওঁর পাসপোর্ট নাকি অল ইণ্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অফিস থেকে হারিয়ে গেছে।

ভারতীয় দল আমিরশাহিতে তিনটি এবং বাহরিনে তিনটি ম্যাচ খেলেছে। প্রথম ম্যাচে আমিরশাহির জাতীয় দলের বিরুদ্ধে ভারত জেতে ২—১ গোলে। গোলে ব্রহ্মানন্দ, চার ব্যাক প্রেমনাথ ফিলিপ, সুব্রত ভট্টাচার্য শেখরন ও শ্যামল ব্যানার্জি, তিন হাফ গৌতম সরকার, দেবরাজ ও প্রসূন ব্যানার্জি এবং তিন ফরোয়ার্ড মানস ভট্টাচার্য, সাব্বির আলি ও সুরজিৎ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয়ার্ধে মানসের জায়গায় আসেন জেভিয়ার পায়াস। উঠে-আসা উইং ব্যাক প্রেমনাথ ফিলিপের সেণ্টারে মাথা ছুঁইয়ে প্রথম গোল করেন সাব্বির। দ্বিতীয় গোলটি আসে সুরজিতের সেণ্টার থেকে—এক্ষেত্রেও সাব্বিরের মাথা ঠিকঠাক কাজ করে।

দ্বিতীয় ম্যাচে সারজা ক্লাবের বিরুদ্ধে ভারত জেতে ২—০ গোলে। এই দিন সুরজিৎ সাব্বিরের সঙ্গে ফরোয়ার্ড লাইনে প্রথম থেকেই পায়াস। স্টপারে শেখরনের জায়গায় পারমার। গোলে ভাস্কর গাঙ্গুলি। এই দিন গোল দুটি করেন সাব্বির আর পায়াস। দুবারই বল জুগিয়েছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। কিন্তু খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে, হাঁটুতে চোট পেয়ে সেই যে সুরজিৎ মাঠ ছাড়লেন—সফরের আর কোনো খেলাতেই মাঠে নামতে পারলেন না।

তৃতীয় ম্যাচে ভারতীয় দলের সঙ্গে আমিরশাহির জাতীয় দল ০—০ করল। এইদিন নরেন্দ্র গুরুং প্রথম টীমে এলেন।

এবার বাহরিন। প্রথম ম্যাচে বাহরিনের জাতীয় দলের কাছে ভারত হারল ০—৩ গোলে। ফুটবলাররা বুঝলেন, সুযোগ নষ্ট না করলে এই ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, দ্বিতীয় ম্যাচে চাকা উল্টোদিকে ঘোরাতে হবে।

দেশের অনেক পণ্ডিত ভারতীয় ফুটবলারদের বলেন কাগুজে বাঘ। কাগুজে বাঘ জ্যান্ত হল ঐ ফিরতি ম্যাচে। গোটা টীম দারুণ খেলল সেদিন। সাব্বিরেরই দেওয়া দুটি গোলে ভারত জিতল। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি নুরুল আমিন বলেছেন, গত পনেরো বছরে তিনি ভারতীয় দলকে এত ভাল খেলতে দেখেননি। অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি এইদিন খেললেন জীবনের সেরা ম্যাচ।

পাঁচ ম্যাচের এই সফরে কারা ভাল খেললেন? সুরজিৎ সেনগুপ্ত জানালেন, "যদি সেরা তিনজনকে বেছে নিতে হয়—ভাস্কর গাঙ্গুলি, শ্যামল ব্যানার্জি আর গৌতম সরকারের নাম করব। যদি এদের মধ্যেও একজনকেই বেছে নিতে হয়, শ্যামল ব্যানার্জির নামের পাশেই টিক মারব।"

আর গোল করেছেন সাব্বির। দলের ছ'টির মধ্যে পাঁচটি গোলই তাঁর। শেষ দিন অনবদ্য দুটি গোলে ভারতকে জিতিয়ে দেওয়ার দুদিন পরে সকালে বাহরিনের প্রায় সব দৈনিক পত্রেই দেখা গেল সাব্বিরের নামে হেডলাইন। ভারতীয় দল বাহরিন ছাড়ার পরের দিন ওখানে একটি ম্যাচে ব্রাজিলের সুপারস্টার রিভেলিনোর খেলার কথা। বাহরিন থেকে অন্যরা ভারতে ফিরে এলেও সাব্বিরের যাওয়ার কথা বাগদাদ। বাহরিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির কাছে সাব্বির বললেন, "আমি বাগদাদ যাবার আগে দু'দিন থাকতে, মানে রিভেলিনোর খেলা দেখতে চাই।" সভাপতি মশাই এক গাল হেসে বললেন, "মিঃ আলি, আপনি এখন এখানে যা পপুলার, দু'দিন কেন, আপনি চাইলে সারা জীবন থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" ফোটো সন্তোষ ঘোষ

# জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল

পুষ্পেন সরকার

তেরোই অক্টোবর শনিবার। বর্ধমানের শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়াম। সময় সন্ধ্যা। নানারঙের আলো জ্বলছে স্টেডিয়ামের চারদিকে। স্টেডিয়ামের মাথায় উড়ছে যোগদানকারী রাজ্যগুলির পতাকা। খেলার দুটি কোর্ট হ্যালোজেন আলোয় ঝলমল করছে। স্টেডিয়ামের সাত হাজার আসন কানায় কানায় ভরা।

এক নম্বর গেটে মেয়েদের সেমিফাইনালে খেলছে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব। পাশেই দু'নম্বর কোর্টে ছেলেদের সেমিফাইন্যাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ। সকলের চোখ এক নম্বর কোর্টে। খেলা যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই উত্তেজনা বাড়ছে।

খেলা নয়। মহারণ। এই দেখা গেল মহারাষ্ট্র এগিয়ে, পরের মিনিটেই পাঞ্জাব টপকে গেল মহারাষ্ট্রের পয়েন্ট।

মনে রাখার মতো খেলা। বিরতির সময় মহারাষ্ট্র ৫৯। পাঞ্জাব ৫৬। খেলা শেষ হতে ক'মিনিট বাকি। পাঞ্জাব ১০৪। মহারাষ্ট্র ৯৭। এক মিনিট বাকি। পাঞ্জাব ১০৪। মহারাষ্ট্র ৯৯। শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়াম কাঁপছে উত্তেজনায়। মাত্র ৬০ সেকেন্ড সময় হাতে। পাঞ্জাবকে ঐ ১০৪ পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে রেখে মহারাষ্ট্র পর পর আট পয়েন্ট নিয়ে দেখিয়ে দিল বাস্কেটবল খেলা কাকে বলে।

১৯৫৫ সাল থেকে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল চালু হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৬ অবধি জাতীয় প্রতিযোগিতায় সিনিয়র ও জুনিয়র দুটি বিভাগের খেলা একই সঙ্গে চলে। ১৯৭৬-এর জানুয়ারিতে কলকাতায় জাতীয় প্রতিযোগিতার পর থেকেই ঐ বছরেই জুন মাসে জুনিয়র ছেলেদের এবং ১৯৭৭ সাল থেকে জুনিয়র মেয়েদের প্রতিযোগিতা আলাদা করে হচ্ছে।

এবার জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবলে ছেলেদের বিভাগে ২০টি এবং মেয়েদের বিভাগে ১৩টি রাজ্য যোগ দিয়েছিল। এতগুলি রাজ্য আগে কখনও খেলেনি। ছেলে ও মেয়েদের দুটি বিভাগেই লীগ কাম নক-আউট প্রথায় খেলা হয়েছে। ছেলেদের ২০টি দলকে পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করে নিয়ে প্রথমে চলে লীগ। এই পাঁচটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের নিয়ে পরে হয় নক-আউট।

কোয়ার্টার ফাইনালে তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান যথাক্রমে কেরল, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবকে হারায়। বাংলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে সুনামের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। সেমিফাইনালে তামিলনাড়ু অন্ধ্রকে এবং রাজস্থান মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে ফাইনালে আসে। ফাইনালে গতবারের রানার্স তামিলনাড়ু যোগ্য দল হিসাবে ৮৯-৭৮ পয়েন্টে রাজস্থানের বিরুদ্ধে জেতে।

তামিলনাড়ুর অধিনায়ক বিজয় রাঘবন এবং রাজস্থানের অধিনায়ক ভারতী সিং দুজনই খুব দক্ষ খেলোয়াড়। এঁরা দুজন ছাড়া প্রতিযোগিতায় অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশি চোখে পড়েছে সব থেকে কমবয়সী মধ্যপ্রদেশের বিপিন শাকে।

বাংলার ছেলেরা গত কয়েক বছর থেকে এবার অনেক ভাল খেলেছে। 'সি' গ্রুপে রানার্স ছাড়া কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার অন্ধ্রের কাছে হার অগৌরবের হয়নি। তরুণ কেজরিওয়াল, শুভাশিস গাঙ্গুলি এবং সম্বুদ্ধ গাঙ্গুলি বাংলার ভবিষ্যৎ শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা রেখেছে। তবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্র এবারের প্রতিযোগিতায় খেলতে না পারায় ছেলেদের বিভাগে খেলোয়াড় আকর্ষণ কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে।

সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুরুতেই বলেছি, অপর সেমিফাইনালে কর্ণাটক সহজেই দিল্লিকে হারিয়ে ফাইনালে যায়। ফাইনালে মহারাষ্ট্র কোন সময়েই কর্ণাটককে তাদের পয়েন্ট টপকাতে দেয়নি। ৭৮-৭৩ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রের ফাইনালে জয়ের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল এস বিদ্যার ও প্রাঞ্জলি কেশকারের।

মেয়েদের মধ্যে সব থেকে ভাল খেলেছে মহারাষ্ট্রের এস বিদ্যা। দলের আক্রমণের রসদ যোগানো ছাড়া বাস্কেট করার কৃতিত্বেও সে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

# রানীর গল্প

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

সাতমহলা প্রাসাদ ছিল,
একটা ছিল পক্ষিরাজ
সিংহদুয়ার পাহারা দিত
গণ্ডাদশেক রক্ষিরাজ
চার মহলায় ছোট্ট রানীর
ঘুম আসে না কিচ্ছুতে
পায়রা-পালক বিছনা সাজায়
কামড়ে মারে বিচ্ছুতে
সেই-যে রানী সুযোগ পেলেই
দৌড়ে পালায় ঐ ছাদে
জিজ্ঞাসাবাদ সবাই করে
ছোট্ট রানী কই কাঁদে?
দুঃখী ছেলে, চমকানো মুখ
দেখছে রানীর চোখের জল
দুধপুকুরে একটা-দুটো
ফুটছে যেন পদ্মদল।

ছবি দেবাশিস দেব

# ধরার ছড়া

রাখাল বিশ্বাস

ইস্টিশানের ধরতে গাড়ি
মিষ্টি গানের ধরছি রেশ,
মেঘ-রোদ্দুর ধরতে পারি
ধরছি খাঁচার সিংহকেশ।
ছুটির পড়া ধরবে বলে
ধরা গলায় তুলছি হাই,
মাঘের ধরা শীতের হাসি
বাঘের মুখে ছুঁড়ছি তাই।
মিনিবাসকে ধরতে গিয়ে
পথ লাগাল লম্বা ছুট,
কেউটে-ধরা বেদের বাঁশি
চমকে দিল বম্বে রুট
ছায়া ধরার গল্প শুনে
ধরতে গিয়ে সিঁধেল চোর,
একলা একা কাটল বসে
বর্ষাকালের বৃষ্টিভোর ॥

ছবি দেবাশিস দেব

# বাঘা ১

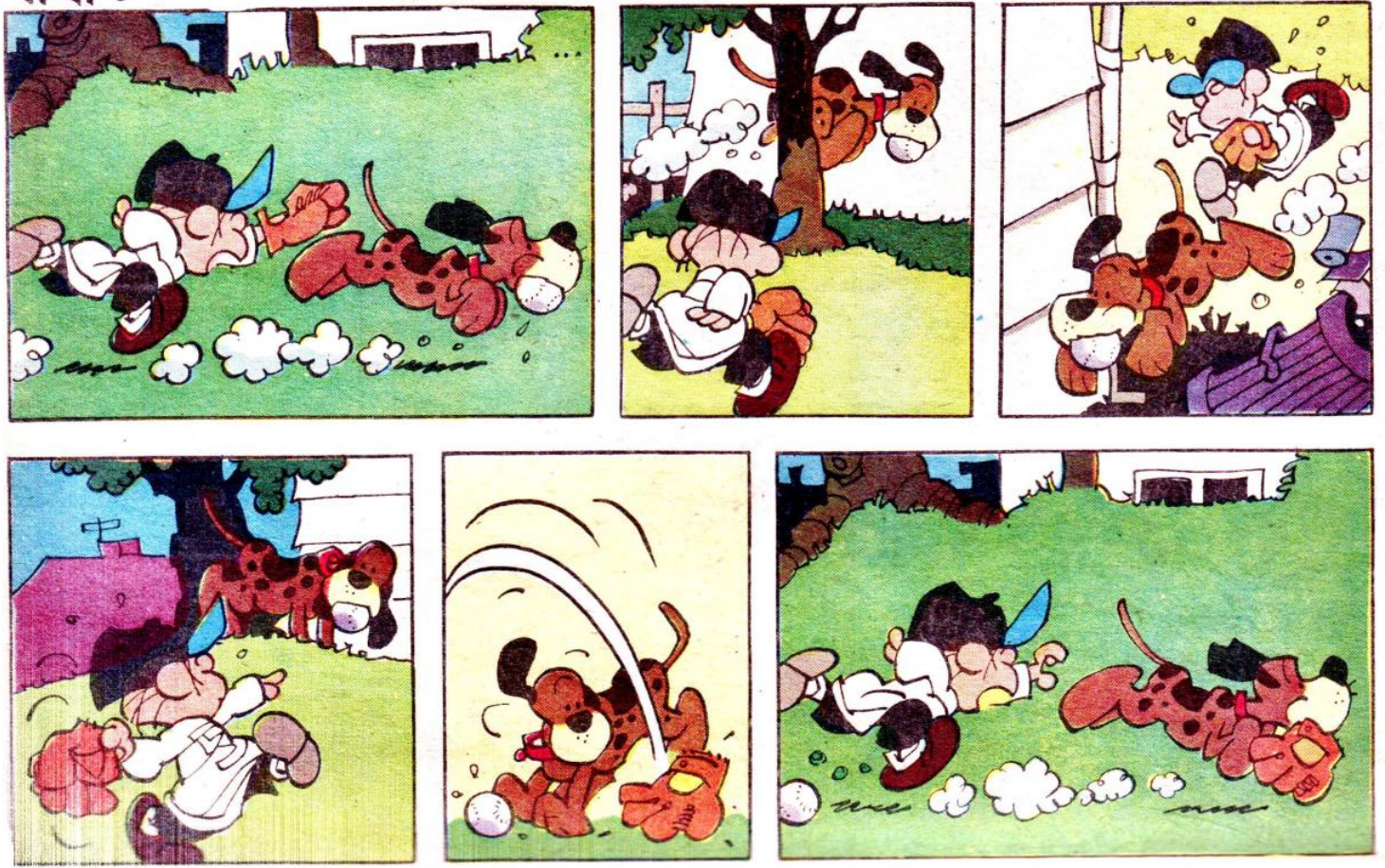

আহা, ঠিকমতো বোলিং করতে শেখাই !
প্রথমে এটাকে দু'ঘরে ভাগ করে নিচ্ছি...
দ্যাখ, করেছি তো ?
এইবারে যে-ঘরে বলটি, সেই ঘরে বল পাঠাব !
নীচের ডান-দিকের ঘরে ? বেশ, তাহলে দ্যাখ !

# টাইগ্রিস-ইউফ্র্যাটিস

## দিদিমণি

পশ্চিম এশিয়ার দুটি প্রধান নদী টাইগ্রিস ও ইউফ্র্যাটিস। নদী দুটি তুরস্কের পূর্বাংশের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়ছে। ইউফ্র্যাটিস নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৭০০ মাইল বা ২,৭০০ কিলোমিটার, টাইগ্রিসের দৈর্ঘ্য ১,১৮০ মাইল বা ১,৯০০ কিলোমিটার। নদী দুটি তাদের তিন ভাগের দু ভাগ গতিপথ অতিক্রম করে মেসোপোটেমিয়ার সমতলভূমিতে এসে পৌঁছেছে—তারপর বাহিত পলিমাটি জমা করে মোহনায় একটি বদ্বীপের সৃষ্টি করছে। নদী দুটির উচ্চভাগে আছে তুরস্কের অ্যানাটোলিয়া। নদী দুটির উৎপত্তিস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট থেকে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। তারপর ১,২০০ ফুট থেকে ১৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচু সিরিয়া ও ইরাকের উচ্চভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে বদ্বীপ অংশে এসে পৌঁছেছে।

দুটি নদীই শীতকালের বৃষ্টি এবং গরমকালের পাহাড়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হয়। মধ্যভাগে কতগুলি উপনদী এসে এদের সঙ্গে মিশেছে। টাইগ্রিসের দুটি উপনদীর নাম গ্রেট জ্যাব এবং লিটল জ্যাব। বালিখ্ এবং এল-খাবুর ইউফ্র্যাটিসের উপনদী। টাইগ্রিস ইউফ্র্যাটিসের চেয়ে খরস্রোতা। ইরাকে প্রতি সেকেণ্ডে এই দুটি নদী ১৭৫,০০০ ঘনফুট জল আর ৩,০০০,০০০ টন পলিমাটি বয়ে আনে। এই মাটির সামান্য ভাগই সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, মেসোপোটেমিয়ার সমতলভূমিতে পলিমাটি কতটা গভীরভাবে জমা হয়।

সিরিয়ার সীমানায় দুটি নদীর মধ্যে দূরত্ব ২৫০ মাইল। এর পরে দুটি নদীর মাঝখানে দেখা যায় চুনাপাথরে ভরা আল-জাজিরা মরুভূমি। এইখানে নদী দুটি গতিপথ একেবারেই পরিবর্তন করে না বলা চলে। নদী দুটির দুই তীরে অনেক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নীচের অংশে গিয়ে নদী দুটি প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করতে থাকে। দুটি নদীর খাতই আশপাশের সমতলভূমি থেকে অনেক উঁচু হয়ে গেছে। দুপাশে বাঁধ বেঁধে নদী দুটির গতিপথ স্থায়ী করা হয়েছে। নদী দুটি থেকে বহু খাল কেটে জলসেচ করায় মরুপ্রায় ইরাকের এই অংশ শস্যসম্পদে ভরে উঠেছে।

টাইগ্রিস নদীর বাঁ তীরে দুটি উল্লেখযোগ্য উপনদী আছে। বাগদাদ শহরের কাছে প্রথমে এসে মিশেছে আল উজাইম এবং পরে দিয়ালা। এই দুটি নদী মেশবার পরে নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শেষভাগে অনেক জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ইউফ্র্যাটিস হাওয়ার এল হামার নামের অগভীর হ্রদের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে টাইগ্রিস নদীর সঙ্গে এসে মিশেছে। তারপর দুই নদীর মিলিত প্রবাহ শাত এল আরব নামে ১০০ মাইলেরও বেশি দক্ষিণ দিকে বয়ে গিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে।

মুরাট এবং কাবাসু নামে দুটি নদী মিলে ইউফ্র্যাটিস নদীর উৎপত্তি। টাইগ্রিসের উৎপত্তি হাজার গোলু নামের একটা ছোট পাহাড়ি হ্রদ থেকে। দুটি নদীর মিলিত প্রবাহ শাত এল আরবের তীরে আছে বিখ্যাত বসরা শহর। এটি ইরাকের নদী-বন্দর। আর খোরামশা হচ্ছে ইরানের নদী-বন্দর।

নদীতে বছরে দু বার বন্যা হয়—একবার নভেম্বর থেকে মার্চের শেষভাগের মধ্যে আর-একবার এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে। দ্বিতীয়টিই বেশি প্রবল। চাষবাসের সুবিধে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে নদীতে অনেক বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

# জবর খবর

## দিগ্‌দর্শক

বেলুনে করে মানুষ আকাশে ওড়ার শখ মিটিয়েছিল একদা। কিন্তু একটা বেলুন কত উঁচুতে উঠে রেকর্ড করেছে বলতে পারো? ৩৪,৬৬৮ মিটার। যিনি উড়েছিলেন, তাঁর নাম মালকম ডি রস। এই রেকর্ড স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬১ সনের ৪ মে। কোথায়? মেকসিকো উপসাগরে।

*

বিমান খুব উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে পারে। এ পর্যন্ত সবচেয়ে উঁচুতে বিমান ওড়ার রেকর্ড কী জানো? ৯৫,৯৩৫·৯৯ মিটার। অর্থাৎ প্রায় ৯৬ কিলোমিটার। এই রেকর্ড করেছেন মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট এম হোয়াইট, ১৭ জুলাই ১৯৬২ সালে।

*

দ্রুততম বিমান কে চালিয়েছিলেন? কবে? মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের এলডেন ডাবলিউ জোরজ ২৮ জুলাই ১৯৭৬ সনে। ঘণ্টায় এই বিমানের গতি ছিল ৩,৫২৯·৫৬ কিলোমিটার। অর্থাৎ কলকাতা থেকে বোমবাই এই বিমানে যেতে লাগবে মাত্র ৩৩ মিনিটের মতো।

*

গ্লাইডার এক নাগাড়ে কত দূর ওড়ার রেকর্ড করেছে? কবে? ১৪৬০·৮ কিলোমিটার। রেকর্ড করেছিলেন পশ্চিম জার্মানির হানস ওয়েরনার গ্রোশ, ১৯৭২-এর ২৫ এপ্রিল। তিনি লয়বেক থেকে বিয়ারিটস-এ গিয়েছিলেন। এই দূরত্ব হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লি যতদূর তার চাইতে সামান্য বেশি।

*

কীভাবে পৃথিবী এক পাক ঘুরে আসতে ১৮৮৯ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক ৯০ বছর আগে, কত সময় লেগেছিল? মনে রাখতে হবে ঐ সময় সবচেয়ে দ্রুত যেভাবে যাওয়া সম্ভব সেভাবেই, অর্থাৎ জাহাজে করে গিয়েছিলেন নেলি ব্লাই। নিউ ইয়রক থেকে যাত্রা ফিরে আসা সেই নিউ ইয়রকেই। মাইলের হিসেব রাখা হয়নি, সময় লেগেছিল ৭২ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিট। মনে পড়ে জুল ভের্ন-এর ৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ? অবশ্য সে ভ্রমণ ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

১৯৭২ সালে পৃথিবী এক পাক ঘুরে আসতে কত সময় লেগেছিল? দূরত্ব ছিল ৩৯,৬৮০ কিলোমিটার। অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন থেকে হয়েছিল যাত্রা শুরু। ট্রেভর কে ব্রুহ্যামের এই দূরত্ব ঘুরে আসতে সময় লেগেছিল ৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট। অর্থাৎ গড়ে মিনিটে সোয়া পাঁচ কিলোমিটারের কিছু বেশি গিয়েছিলেন। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে কি না বলো?

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যস্ত বিমানবন্দর হল শিকাগোর ও' হেয়ার বিমানবন্দর। ১৯৭৬-এ এখানে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১৭৪টি বিমান ওঠানামা করেছিল। অর্থাৎ দিনে প্রায় ১৯৬৮টি বিমান এই বন্দরে ওঠানামা করেছিল। ঘণ্টায় ৮২টি বিমানের নামাওঠার আওয়াজ—কী ধুন্ধুমার কান্ড বলো তো!

*

একটি আশ্চর্য বিমান রেকর্ড হয় ১৯৭১ সালে। সান ফ্রানসিসকো থেকে বিমানে করে পৃথিবী পরিক্রমা করেন এলগেন লং—একা। দূরত্ব ছিল ৩৮,৮৯৬ মাইল। সময় লেগেছিল ২৮ দিন ৪৩ মিনিট। এটা এমন কিছু নয়, কিন্তু লংয়ের একটি অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। সেটি হল তিনি দুটি মেরুর উপর দিয়েই উড়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি মিনিটে গতি ছিল তাঁর ১·৮৪৯৮০৫৩ কিলোমিটার।

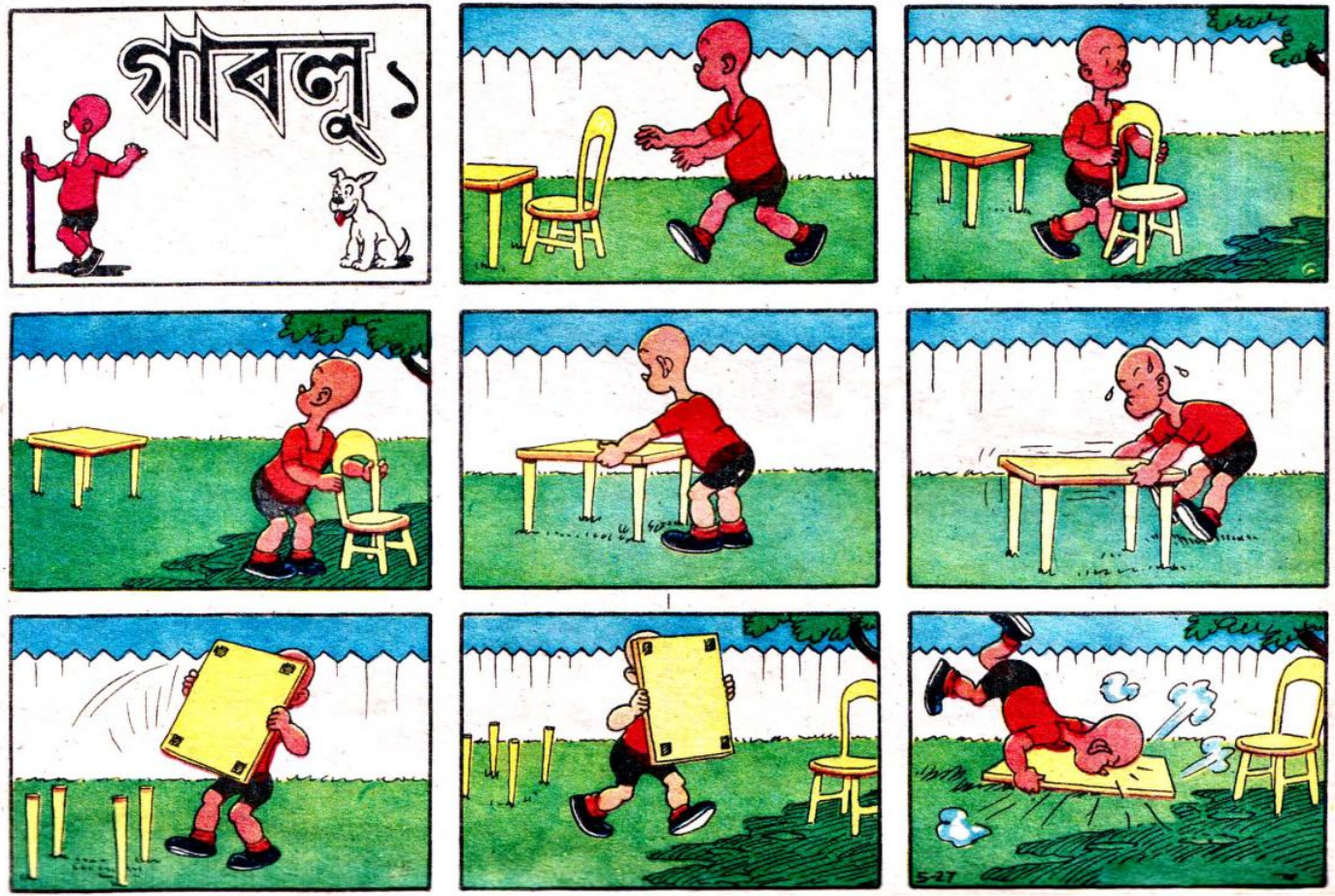
গাবলু ১
527

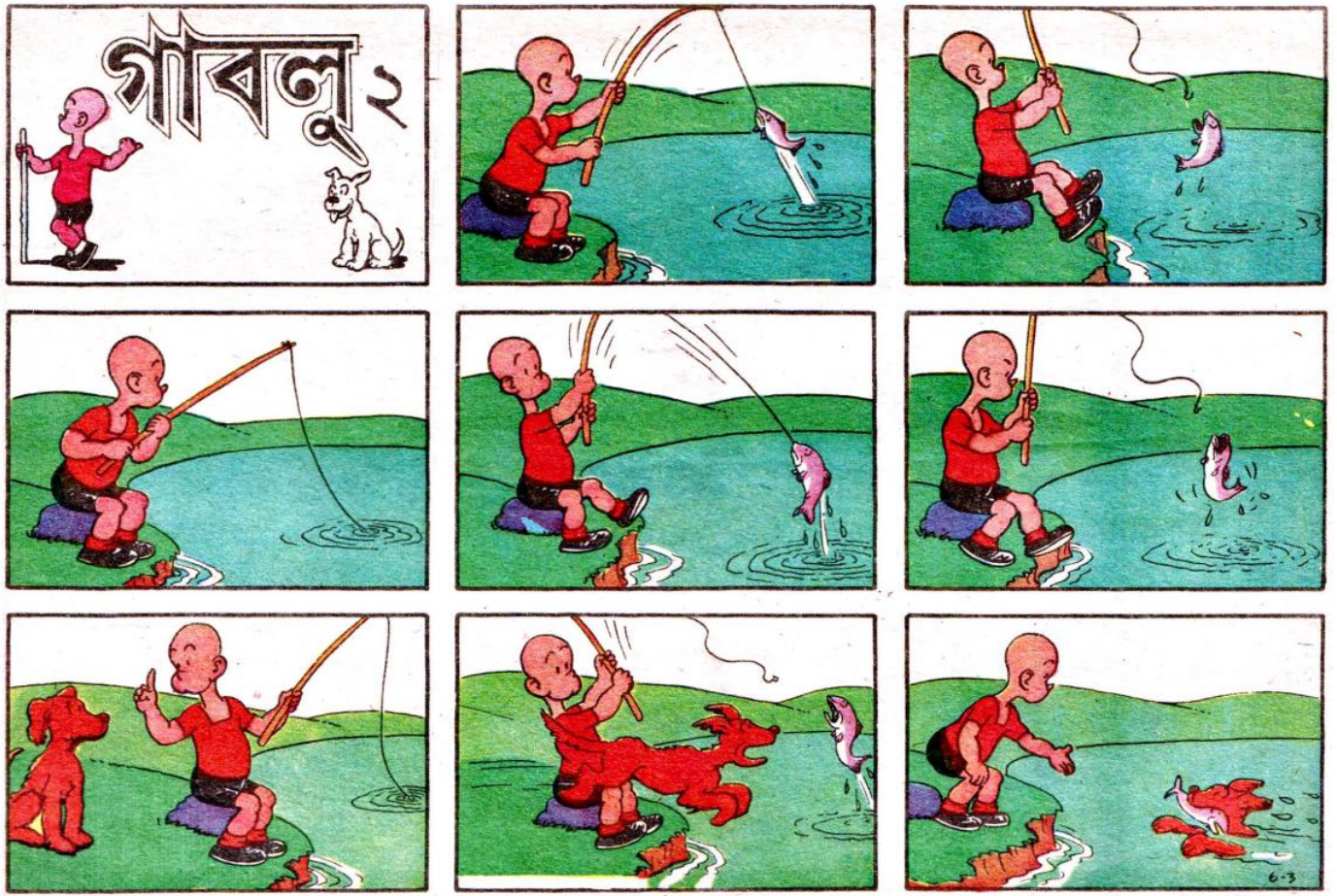
গাবলু ২
6-3

## রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

### সিঁড়ি

ধাপের জন্যে এবার দরজা থেকে নীচ পর্যন্ত দুই সীমারেখাকে (ক + খ) সমান ভাবে ভাগ করে দুই প্রান্তকে (গ থেকে গ) যোগ করে দিলে সিঁড়ির ধাপের ভাগ পেয়ে যাবে। আসছে বার দেখো।

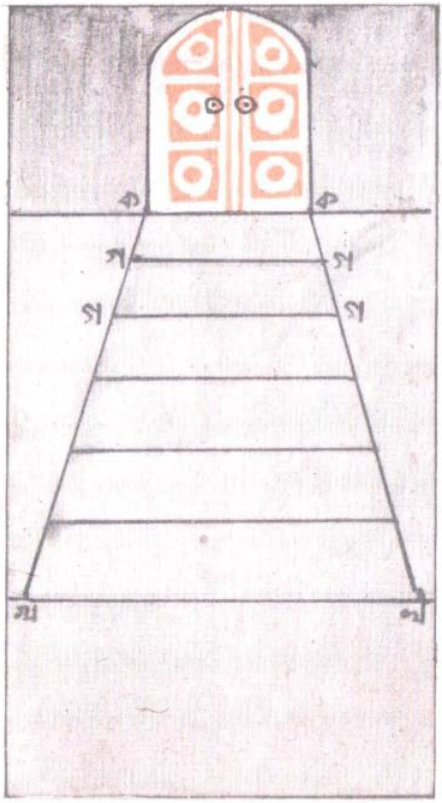


## কারিগর

### বাঁশের কাজ—ফুল ২

পুঁতি বসানো হলে, কেটে রাখা সরু সরু কাঠি গুলোকে গুচ্ছ করে, ওপরের ডগায় সামান্য আঠা ছুঁইয়ে রাখা সরষের মধ্যে ঠেকালেই তা রেণু হয়ে আটকাবে। একই ভাবে কোরকের মাঝে আঠা দিয়ে পোস্ত ছড়ালেই রেণুতে কোরকের গা ভরে উঠবে। রেণু-লাগানো কাঠি কোরকের গায়ে আটকে দাও প্রয়োজন-মাফিক। (চ ছবি) এবার কোরকের তলায় (ছ ছবি) পাপড়িগুলো পর পর আটকে দিতে পারলেই বাহারি ফুল। পাতা আর ফলের জন্যে ডাঁটি তৈরি করে তার গায়ে পাতলা পাতির পাতা জুড়ে দাও সমানভাবে (জ ছবি) পাতা লাগানোর আগে তৈরি ডাঁটিটি কোরকের উল্টো দিকে বসানো পুঁতির গর্তে (ঙ ছবি) শক্ত করে লাগিয়ে নিও।

জেনে রাখো—(১) ফুল রঙিন করতে চাইলে ক্রাইলিন রং ব্যবহার করবে।

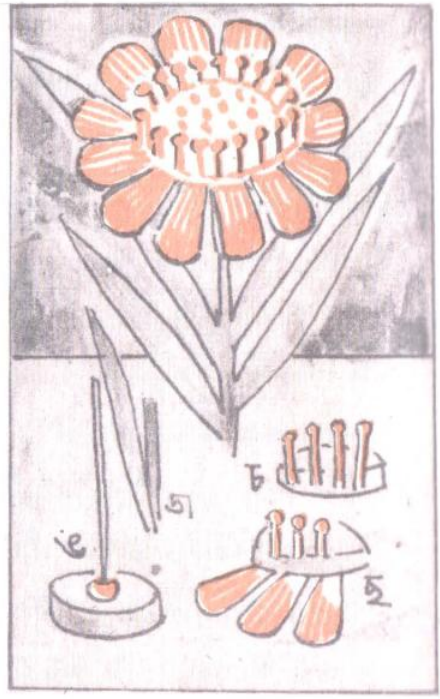

সাধারণ পরিষ্কার করার পাউডার ব্যবহার করার পর
কিছু অবশিষ্ট পুঁড়ো থেকে যাওয়া সম্ভব



# ভিম আনে নিখুঁত ঝলমলে চমক !

## এর মধ্যে আছে দেড়গুণ পরিষ্কার করার ক্ষমতা

ভিমে আছে পরিষ্কার করার যে কোনো পাউডারের চেয়ে বেশী ডিটারজেন্ট। তাই এর বাড়তি পরিষ্কার করার ক্ষমতা—তেলাভাব আর সমস্ত দাগ নিমেষে সাফ করে দেয়, কোনো গুঁড়ো অবশিষ্ট রাখে না।

তা ছাড়া ভিম অতি-মিহি ও মোলায়েম হওয়ার ফলে পরিষ্কারও ভালো হয় অথচ আঁচড় পড়ে না। ভিম ব্যবহারে সব কিছু ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

**আপনার ২৫% দাম বাঁচবে এই প্যাক কিনলে**

হিন্দুস্থান লিভারের এই উৎকৃষ্ট উৎপাদন কেবল ৬০০ গ্রাঃ ও ২.৫ কেজি প্যাকে পাওয়া যায় কখনও খোলা বিক্রী হয় না।

লিনটাস-V.56-2115 BG

# কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালভাবে ওর দাঁতের পরিচর্যা করতে পারে

৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের দাঁতে সহজেই ক্যাভিটি হতে দেখা যায়। এসব বছরেই দাঁত ক্যাভিটির কবলে পড়ে। তাই দাঁত পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য আপনার বাচ্চাকে নিয়মিতভাবে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। তবে রোজ আপনি নিজের বাড়ীতে বসে সহজেই দাঁতের ক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ ক'রে।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে জীবাণু সৃষ্টি হয়। ফলে, মুখে দুর্গন্ধ এবং পরে যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের ক্ষয় শুরু হতে পারে। কলগেটের অপূর্ব্ব সক্রিয় ফেনা দাঁতের ভেতরে গভীরে পৌঁছে বিপজ্জনক খাবারের টুকরো আর জীবাণু দূর ক'রে দেয়। তাই আপনার বাচ্চাকে, প্রতিবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে শেখান। বাচ্চারা কলগেট দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালওবাসে। কারণ, এতে আছে সতেজ পিপারমিন্টের স্বাদ।

**জীবাণুমুক্ত নির্ম্মল শ্বাস প্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশী কেনে কলগেট টুথপেস্ট।**

DCG 70 BN